স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

ফিঙে

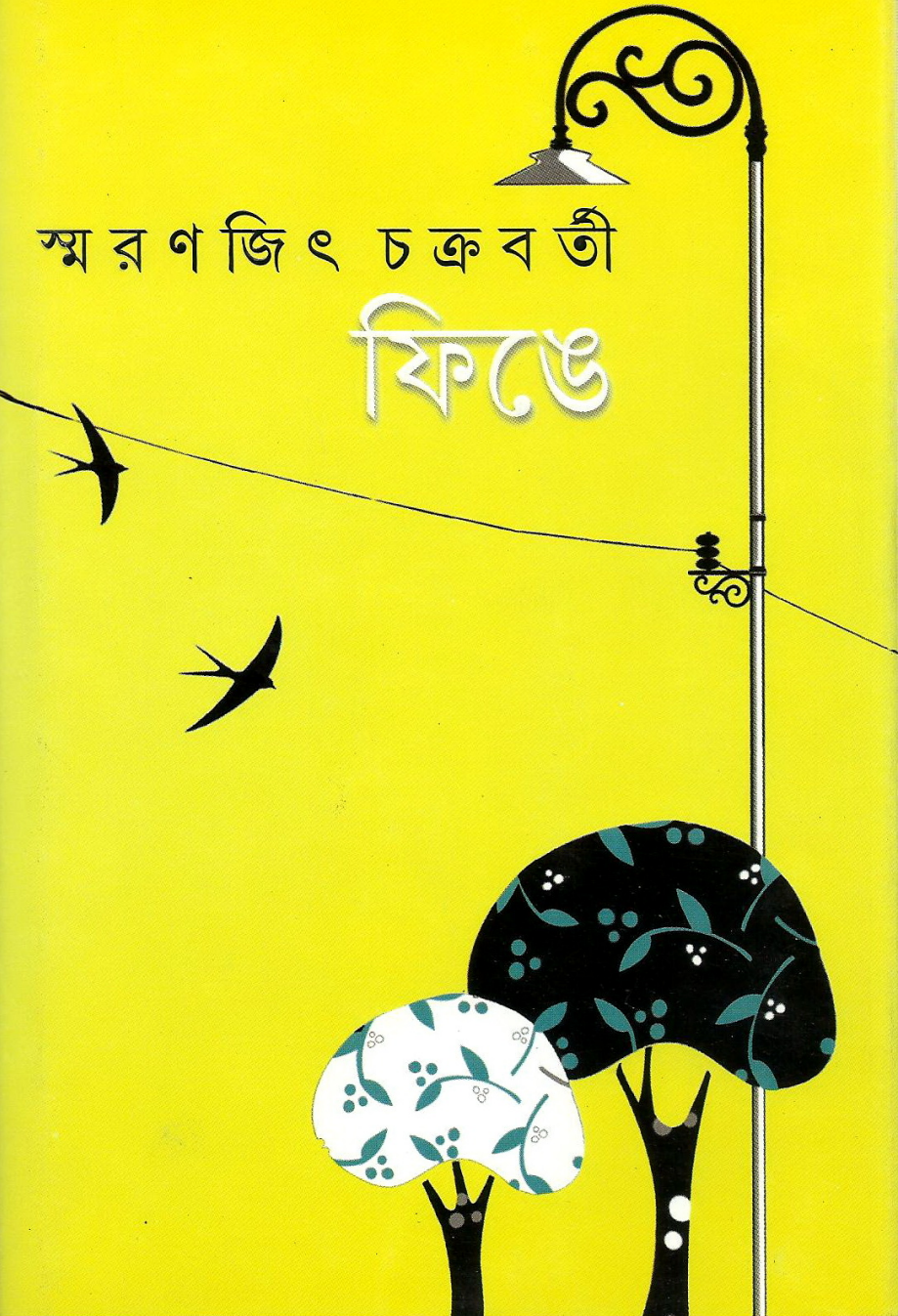

ফিঙে

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

আনন্দ

সে যাই বলুক বিজ্ঞ লোকে
মুঠোয় ধরো সমুদ্রকে
ভরুক, মন ভরুক
ফড়িং বসুক মোষের শিং-এ
তোমার বুকের ছোট্ট ফিঙে
উড়ুক, আরও উড়ুক...

মৃণালদা আর সোনালীদি, তোমাদের

ফিঙেটা উড়ছে। এ গাছ থেকে ও গাছ হয়ে টেলিফোনের তারে, কেব্‌লের সাসপেন্ডারে ড্রপ খেতে খেতে পাখিটা চলেছে আমাদের গাড়ির সামনে সামনে। কী অদ্ভুত! পাখিটা কি পথ দেখাচ্ছে আমাকে? কোথাও কি পৌঁছে দিতে চাইছে? শীতের কলকাতা ডানা মেলছে এখন। আমি জামার হাতাটা গুটিয়ে গাড়ির জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। ছাইরঙের একটা বুড়ো আকাশ। তাতে ময়লা হলুদ প্লাস্টিকের মতো রোদ লেগে আছে। রথের পরের সময়টায় কেমন যেন একটা গা-ছাড়া ভাব থাকে কলকাতার। আমার বন্ধু পটাই বলে, "এটা হল মিনিমালিস্ট বিউটি, বুঝলি লাল?"

মিনিমালিস্ট বিউটি না হাতি! বুড়ো বয়েসে চুল পড়ে যাওয়া, দাঁত পড়ে যাওয়াও তা হলে মিনিমালিস্ট বিউটি! ওসব ঢপবাজির কনসেপ্ট দিয়ে পটাই আমার কাছে বিশেষ সুবিধে করতে পারে না। তবে আমি মুখে কিছু বলি না। পটাই সাংবাদিক। একটা নামকরা ম্যাগাজিনে কাজ করে। আর্ট অ্যান্ড কালচার বিভাগটা দেখে ও। কলকাতার জ্ঞানবৃদ্ধ মহলে বেশ পরিচিতিও আছে। মোটামুটি সকলেই প্রদোষ রায়কে চেনে। আর তাই ওর ধারণা, ও সব বিষয়ে মাতব্বরি করতে পারে। তবে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিই না ওকে। সকলের কাছে ও প্রদোষ হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ও পটাই। সেই হাফপ্যান্টের বন্ধু।

"কী রে, গুম মেরে বসে আছিস? বাড়ির জন্য মনখারাপ করছে?" পটাই বোসপুকুর মোড় থেকে ডানদিকের রাস্তায় গাড়িটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"না, কিছু না," আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললাম।

"মাইরি, ফালতু ফালতু এখানে পি জি থাকছিস। আমার লেক গার্ডেন্সের বাড়ির নীচের ফ্লোরে দুটো ঘর খালি ছিল। থাকলেই পারতিস।"

"না, এটাই ভাল," আমি ছোট করে বললাম।

"কেন? আমার বাড়িতে থাকলে কী হত?" পটাই অভিমানের গলায় বলল।

"বাবা বলত, সেই তো আমার বন্ধুর বাড়িতেই গিয়ে উঠতে হল! নিজের তো কিছু করার মুরোদ নেই। তাই আমার একাই ভাল।"

"না হয় মানলাম, আমার বাবা আর তোর বাবা বন্ধু। তা বলে আমার বাড়িতে আমার কোনও বন্ধু থাকতে পারে না? এ কেমন কথা? এ তো ভাল অ্যাটিটিউড নয়। এও তো একরকমের সোশ্যাল স্লেভারি। সব বাবা মায়েরাই যা না বুঝে সন্তানদের উপর ফলায়।"

বুঝলাম, পটাইয়ের বায়ু চড়েছে। আসলে বেশিক্ষণ বিতর্ক ছাড়া থাকতে পারে না ও। তা হলেই পেট টিসটিস করে, মাথা ঘোরায়, চোখে অন্ধকার দেখে! এই যে আমি চুপ করে বসে আছি, এটা ঠিক সহ্য হচ্ছে না ওর।

আমি বললাম, "রাস্তায় মন দে। সারাজীবন আমার নর্থে কেটেছে, এই বোসপুকুর টুকুর আমার একদম অচেনা। নম্বর গুলিয়ে ফেললে বাড়ি খুঁজতে জান বেরিয়ে যাবে।"

পটাই হাসল, "জান তো তোর এমনিতেই বেরোবে রে শালা, যে পাল্লায় পড়েছিস!"

আমি কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলাম। না, আজ পটাইকে সুযোগ দেব না। ও যেভাবেই হোক, একটা তর্ক লাগানোর তাল করছে। আর আজ আমার এসব ভাল লাগছে না একদম। আমি চলে আসার সময় শ্রী এমন কান্নাকাটি করছিল যে, আমার একদম মন ভাল নেই। কেমন যেন নিজেকে স্বার্থপর মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, নিজের জন্য কি আমি আমার কাছের মানুষজনদের দুঃখ দিচ্ছি? দাদাও ছলছলে চোখ নিয়ে

আমার দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু বাবা যা বলেছে, তারপর কি আর আমার ওবাড়িতে থাকা চলে?

পটাই বলল, "কেমন রে বাড়িটা? নিজেই তো ঠিক করলি! আচ্ছা, তোকে যেতে হবে সেক্টর ফাইভে, ওখানের কাছাকাছি পেলি না কিছু? বোসপুকুর থেকে যেতে সময় লাগবে না?"

"যা পেলাম, নিলাম। এখানে থাকি কয়েক মাস, তারপর না হয় অন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

"তুই কি আর সত্যিই বাড়িতে ফিরবি না?" পটাইয়ের গলাটা কেমন যেন নরম হয়ে এল, "তোর বাবার কিন্তু বয়স হয়েছে। রাগের মাথায় কী বলেছেন, সেটা মনে রাখতেই হবে? রাগ হলে কি মানুষের মুখ দিয়ে খারাপ কথা বেরোয় না? সেটাকে এমন গুরুত্ব দেওয়ার কী আছে?"

আমি বললাম, "এইমাত্র তো কীসব স্লেভারি টেভারি নিয়ে বাতেলা করছিলি! এখন আবার পালটি খাচ্ছিস কেন?"

"শোন," পটাই ওর বিশাল শরীরটা নিয়ে নড়েচড়ে বসল।

এই রে, বিষয়টা ওর কমন পড়ে গিয়েছে! এবার আমার কানের মাথা খাবে!

ও বলল, "শোন লাল, তুই বেসিক জিনিসটায় গন্ডগোল করছিস। আমি প্রথমে যে-কথা বললাম, সেটা ইন জেনারেল বাবা-মায়েদের সারফেস মেন্টালিটি। আর এটা ইন ডেপ্‌থের কথা। তুই কেন এই দুটোকে গুলিয়ে ফেলবি?"

বললাম, "ঠিক বলেছিস।" জানি, কথা বাড়ালেই বিপদ! আমি হাতের ঠিকানাটার দিকে একবার তাকিয়ে আবার রাস্তার দিকে তাকালাম, "এখানে একটা কনফেকশনারি আছে। সেটা কি কথায় কথায় পেরিয়ে এলাম?"

"তুই তো আগে একবার এসেছিস! তাও চিনতে পারছিস না? ক্যালানে নাকি?" পটাই অবজ্ঞার শব্দ করল।

"আরে, সে তো সন্ধেবেলা এসেছিলাম। তাও সেদিন হঠাৎ করে

বৃষ্টি নেমেছিল। তাই...” আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম। এটা আমার একটা দুর্বলতা। কিছুতেই কোনও রাস্তা আমি একবার দেখে মনে রাখতে পারি না।

“তো?” পটাই আবার দেখল কোয়েশ্চেন কমন পড়ে গিয়েছে, “তা বলে কলকাতা তো আর ক্যালিফোর্নিয়া হয়ে যায়নি। আচ্ছা, বৃষ্টির পর কি রাস্তাঘাটের ভৌগোলিক অবস্থান চেঞ্জ হয়ে যায় যে, তুই চিনতে পারছিস না? দেখিস, কলম্বাসের মতো কান খুঁজতে গিয়ে ধান না খুঁজে আনিস!”

আমার মাথা এমনিতেই খারাপ ছিল, এখন আরও খারাপ হয়ে গেল। তখন থেকে চেষ্টা করছি যাতে না ঝগড়া হয়, আর এ মালটা ঝগড়া করবেই! আমি বললাম, “তা তুই তো সাউথের ছেলে, তুই চিনিস না কেন? ঢপের সাংবাদিক হয়েছিস!”

পটাই বলল, “দ্যাখ, আমি ট্যাক্সি চালাই না যে, কলকাতার ম্যাপ সারারাত ধরে দুলে দুলে মুখস্থ করে রাস্তায় বেরোব। আমার কি আর অন্য কোনও কাজ নেই?”

আমি গলার টেম্পারেচর স্ট্যাটিক রেখে বললাম, “কী ভাটের কাজ করিস তো জানি। কোথায় কী এগজিবিশন হল, সেখানে কিছু ট্যারা-বাঁকা ছবি আর ভুলভাল মূর্তি রাখা হল, সেগুলো দেখে ডিকশনারি খুঁজে কঠিন কঠিন বাংলায় প্রোজ লিখিস। আর ভাবিস, কেউ তো পড়ে না, তাই যা খুশি লিখলেই হল।”

“শালা!” পটাই আমার দিকে ঘুরে বসতে চাইলেও পারল না। স্টিয়ারিং-এ ভুঁড়ি আটকে গেল ওরা, “আমায় হিটিং বিলো দ্য বেল্ট! তুই মূর্খ, তাই পড়িস না। যারা পড়ার, তারা ঠিক পড়ে। আর শোন, কালচার তোর মতো ভালচারের জন্য নয়। তোর চোখ তো সবসময় ভাগাড়ে থাকে। ইন্টারনেটের সব পর্ন সাইট তো মুখস্থ, তুই বুঝবি কী রে!”

“ও তাই?” আমি দাঁত চেপে বললাম, “পরের বার তেল মারতে

আসিস ওসব সিনেমার জন্য, ভজনের সিডি হাতে ধরিয়ে দেব!"

"আরে, আরে," পটাই একটু টসকাল, "তুই সিরিয়াসলি রাগ করলি নাকি? আমি তো জাস্ট ডিফারেন্স বলছিলাম। পর্নোরও একটা সাবভারসিভ গুরুত্ব আছে। এটা আন্ডারবেলি হলেও একটা ইম্পর্ট্যান্ট জোন ইন হিউম্যান সোসাইটি। আমায় এটারও তো আপডেট রাখতে হয়।"

"আবার ঢপবাজি!" আমি বললাম, "তোর তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তা এসব দেখিস কেন রে?"

পটাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর সব হারিয়েছে এমন গলায় বলল, "সেই জন্যই তো দেখি ভাই। স্বপ্ন ভাঙার পরই তো বোঝা যায় স্বপ্ন কী ছিল!"

আমি উত্তর দিতে গিয়েও থামলাম, "ওই তো কনফেকশনারি।" আমি এমন করে চেঁচিয়ে উঠলাম যেন তেত্রিশ বছর পর কুম্ভমেলায় হারিয়ে যাওয়া ছোট ভাইকে খুঁজে পেয়েছি, "এর পাশের ওই বাঁদিকের গলিতে ঢোক।"

পটাই গাড়ির ইন্ডিকেটর মেরে জিজ্ঞেস করল, "তুই শিয়োর?"

"শালা, গোটা দেশজুড়ে অমিতাভ সিনড্রোম কেন রে?" আমি খেঁকিয়ে উঠলাম।

"না, মানে, তোর যা পাস্ট রেকর্ড, তাতে ভরসা করি কী করে বল? মনে আছে, একবার কলেজের এক ম্যাডামের বাড়িতে যেতে গিয়ে ভুল করে সোনাগাছিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলি?" পটাই সাবধানে বাঁদিকের সরু গলিতে গাড়িটা ঢুকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল।

আমি চুপ করে রইলাম। কথাটা সত্যি। কিন্তু কী করব? সত্যি, আমি ঠিক রাস্তা চিনতে পারি না। তবে এটাই যে সেই রাস্তা, আমি শিয়োর। কারণ, এখানে যেদিন এসেছিলাম, সেদিন এই কনফেকশনারির সিঁড়িতেই বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। ওই সান্তাক্লজের কাট আউটটা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

"এবার?" পটাই সামনে থেকে আসা একটা সাইকেলকে কোনওমতে কাটিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এবার বাড়িটা চিনতে পারবি তো? নাকি সেখানেও ধ্যাড়াবি?"

"না, চিনতে পারব। বাড়িটার সামনে একটা বড় বোগেনভেলিয়ার ঝোপ আছে। আর তার পাশে কয়েকটা মুসান্ডাও আছে।"

পটাই সামনে থেকে আসা একটা রিকশাকে কাটিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, "শালা, আর জায়গা পাসনি! এমন সরু গলিতে আমি এখন গাড়িটা পার্ক করব কোথায় বল তো? এরকম গলির ভিতর তোকে কে বাড়ি নিতে বলেছে? খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, ওই মিকির পাল্লায় পড়ে কেন যে তোর এঁড়ে গোরু কেনার শখ হল, ভগাই জানে!"

আমি চোয়াল চেপে কথাটা গিলে নিলাম। না, এর উত্তর দেব না। কারণ, আমার বাড়ি থেকে এক্সোডাসের কারণই তো মিকির যাতে কেউ অসম্মান না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। আমি চাই না পটাই বা অন্য কেউ মিকিকে নিয়ে কোনও কথা বলে। প্রসঙ্গ ঘোরাতে বললাম, "ওই সামনে ডানদিকের বাড়িটা।"

"শিয়োর?" পটাই আবার জিজ্ঞেস করল।

"ওই দ্যাখ, বোগেনভেলিয়ার ঝোপ রাস্তার উপর কীভাবে ঝুঁকে এসেছে।"

পটাই বলল, "ও কে। তা গাড়ি রাখব কোথায়?"

"সামনে থেকে দেখলে বোঝা যায় না। কিন্তু ভিতরে বেশ জায়গা আছে। রোড রোলার পর্যন্ত পার্ক করা যাবে।"

"আমি রোড রোলারের কথা জানতে চেয়েছি?" পটাই ভুরু কোঁচকাল।

আমি সামান্য হেসে ওকে আগাপাশতলা দেখে নিয়ে বললাম, "তোর কথা বলছিলাম আর কী!"

"শালা!" পটাই রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলল, "তাও ভাল, তুই হাসলি! কয়েক সপ্তাহ যাবৎ যা গ্যাঁদাল পাতা খাওয়ার মতো মুখ

করে ছিলি! আমি তো ভেবেছিলাম তোকে টেলি শপিং থেকে লাফিং কোর্সের বই কিনে দিতে হবে!"

বাড়িটার সামনে রোগামতো দারোয়ানটা বসে ছিল। এর নাম ভরত। এখানে আসার আগে আমি যখন বাড়ির মালিক নীতীশবাবুকে ফোন করেছিলাম, উনি বলেছিলেন যে গেটে ভরত থাকবে, ওকে বললেই ও খবর দিয়ে দেবে।

আমি গাড়ি থেকে নেমে ভরতের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, "আমি লালমোহন। আমার আজকে আসার কথা ছিল।"

ভরতের বয়স বাইশ-তেইশ। দড়িপাকানো চেহারা। গালের হাড় দুটো টিপির মতো উঁচু হয়ে আছে। বাংলায় কথা বললেও ও যে গো-বলয়ের মানুষ ওর উচ্চারণেই সেটা স্পষ্ট। ও বলল, "আমি জানি। সাব বলিয়ে রেখেছেন। আমি গেট খুলিয়ে দিচ্ছি। আপনারা গাড়ি পারকিন মেরে দিন।"

কালো রঙের গেটটা খুলে দিতেই পটাই ওর গাড়িটা ঢুকিয়ে দিল ভেতরে।

বাড়িটা বেশ বড়। লোহার গেট খুললেই সামনে লম্বা মতো বাঁধানো ড্রাইভ-ওয়ে। তার প্রায় শেষে বাড়িতে ঢোকার সিঁড়ি। বাড়িটা দোতলা। নীচের তলাটা বন্ধ থাকে। এবাড়ির মালিকের নাম নীতীশ রায়। এর ছোটভাই ক্ষিতীশ রায় থাকেন কানাডায়। নীচের তলাটা ওঁর। তাই অধিকাংশ সময় সেটা বন্ধই থাকে। দোতলাটা নীতীশবাবুদের। ভদ্রলোকের এক মেয়ে আছে শুধু। তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সেও অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। এখানে ভদ্রলোক স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন।

বাড়ির খোঁজ আমি চাকরি পাওয়ার পর থেকেই করছিলাম। আসলে চাকরিতে জয়েন করার আগেই নিজের নতুন আস্তানায় শিফ্‌ট করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না কোথায় থাকা যায়। তখন হঠাৎ এক রবিবার এই পেয়িং গেস্টের বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছিলাম। তার কয়েকদিন পরে ভদ্রলোক দেখা করার জন্য সময় দিয়েছিলেন।

বাড়িটা দেখে বেশ অবাকই লেগেছিল। নীতীশ রায়ের যে পয়সা আছে, সেটা দেখলেই বোঝা যায়। তা হঠাৎ এমন একটা লোক কেন যে পেয়িং গেস্ট রাখতে চাইছেন, সেটা বুঝতে পারছিলাম না।

আমার মুখ-চোখ দেখে হয়তো ভদ্রলোক আন্দাজ করতে পেরেছিলেন আমি কী ভাবছি। উনি বলেছিলেন, "অবাক হচ্ছ, না? আমি কেন পেয়িং গেস্ট রাখতে চাইছি সেটা বুঝতে পারছ না, না?"

একটু অপ্রস্তুত হয়েছিলাম। আসলে কে কী করতে চাইছে, সেটা আমার জানার কী দরকার? আমার তো একটা থাকার মতো জায়গা হলেই চলবে। বলেছিলাম, "না, না, আমি তেমন ভাবছিলাম না।"

নীতীশবাবু হেসে বলেছিলেন, "তাই? আসলে আমরা বুড়ো বয়সে ঘরে বসে বসে হেদিয়ে যাচ্ছিলাম। তাই তোমার কাকিমা বললেন যে, কয়েকটা ঘর তো পড়েই আছে, একজন পেয়িং গেস্ট রাখো। তার দেখাশোনা করতে করতে সময় বেশ কাটবে।"

আমি ভদ্রতা করে হেসেছিলাম। তারপর ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে সবকিছু ঠিকঠাক করে বেরিয়ে পড়েছিলাম বৃষ্টির মধ্যেই।

আমাদের গাড়ির আওয়াজ পেয়ে নীতিশবাবু নেমে এলেন বাইরে। বললেন, "আরে, তুমি এসে গিয়েছ? তা তোমার লাগেজ কই?"

গাড়ির পিছনের দিকে লাগেজটা রাখা ছিল। দুটো বড় বড় ব্যাগ। একটা ট্রাঙ্ক, পিঠের ব্যাগ আর ল্যাপটপ ব্যাগ। ভদ্রলোক সেগুলো আমাদের বইতে দিলেন না। ওঁর নিজের দুটো কাজের ছেলে আর ভরতকে দিয়ে মালগুলো পাঠিয়ে দিলেন উপরের ঘরে। তারপর বললেন, "তা তোমার বন্ধুটির সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলে না!"

আমি পটাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললাম, "ও সাংবাদিক।"

"তাই?" নীতীশবাবু হাসলেন, "তা হলে তো সাবধানে কথা বলতে হবে।"

পটাইও পালটা হাসল, "কেন? সাবধান থাকার মতো কি কিছু আছে নাকি?"

নীতীশবাবু থতমত খেয়ে কোনওমতে হেসে সামলালেন নিজেকে। ভাবলাম, বাঁচা গেল। পটাই না হলে এখানেও ডিবেট শুরু করে দিত।

আমার ঘরটা একতলা আর দোতলার মাঝামাঝি। তবে মেজানাইন ফ্লোর ঠিক নয়। বরং প্রমাণ সাইজের ঘরের মতোই। ঘরে একটা সিঙ্গল বেডের খাট, টেবিল চেয়ার, আর একটা দেওয়াল আলমারি আছে। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমও আছে। এই ঘর থেকে ছ'টা সিঁড়ি উঠে গেলে নীতিশবাবুদের ফ্লোর। সেখানে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটা লিভিং কাম ডাইনিং রুম। তাতে খাবার টেবিল থেকে সোফা, টিভি, সবই আছে। আমায় ওখানে গিয়েই খেতে হবে। কারণ, একমাত্র অসুস্থ না হলে ঘরে খাওয়ার নিয়ম নেই। নীতিশবাবুর স্ত্রী, শুভা কাকিমার খুব এঁটো-কাটার বাতিক। নীতীশবাবুই সেটা আমায় চাপা গলায় প্রথমদিন জানিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য আমি জানি এসব ব্যাপার। আমার মায়েরও এমন বাতিক ছিল। মা মারা যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত এঁটো নিয়ে বাড়ির কাজের মেয়েদের বকুনি দিয়ে গিয়েছে। আমি এসব নিয়ে কারও সঙ্গে ঝামেলা করি না। যার যা বিশ্বাস! তবে এঁটোর কন্ডাকটেন্সটা এতদিনেও আমি ঠিক বুঝি না।

সিঁড়িতে কয়েক পা উঠেই উপরে একটা মেয়ের গলার স্বর শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। গলাটা বেশ সুন্দর। কিন্তু তার মাধ্যমে যে কথাগুলো বেরোচ্ছে, সেগুলো খুব একটা সুন্দর নয়। শুনলাম সেই নারীকণ্ঠ বলছে, "কী রে ভরত? এত মাল? এ মেয়ে নাকি? গোটা ড্রেসিংটেবিল প্যাক করে নিয়ে এসেছে নাকি?"

ভরত বলল, "না, না। একজন মোটা লোকের সঙ্গে নতুন দাদাটি আসিয়া গেল।"

"তুই শিয়োর এ দাদা? দিদি নয় তো? আর ট্রাঙ্ক নিয়ে এসেছে! গড হেল্‌প আস। কেমন রে মক্কেল?"

থতমত খাওয়া মক্কেলের দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিলল পটাই। যে-মেয়েটার গলা শোনা যাচ্ছে, তার যে গোডাউনে প্রচুর কনফিডেন্স, তা বোঝা যাচ্ছে বেশ! আর যে-কোনও কনফিডেন্ট মেয়েকে ফেস করতে একবার হলেও, সামান্য হলেও, বুক কাঁপে ছেলেদের। আমারও কাঁপল। এখানে কোনও মেয়ে থাকে জানতাম না তো!

উপরের কথা নীতীশবাবুরও কানে গিয়েছে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উনি অপ্রস্তুতের হাসি হেসে আমার দিকে তাকালেন। তারপর জড়তা মেশানো গলায় বললেন, "ও অণু। তোমায় বলা হয়নি। আমাদের সঙ্গেই থাকে।"

এখানে একটা মেয়ে থাকে? কী বলব, বুঝতে পারলাম না। আর তাও এমন একজন মেয়ে!

পটাই আমার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, "কাকা সামলে! পিচ প্রথমদিনেই ভাঙা মনে হচ্ছে, বল ভোগাবে। আর অণু-পরমাণু নিয়ে কাজ। একটু এদিক ওদিক হয়েছে কী নাগাসাকি, বুঝেছ?"

নীতীশবাবু দ্বিধার সঙ্গে বললেন, "উপরে চলো, ওর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।"

দুই

কিন্তু না! তার আগে আমি একটু আলাপ সেরে নিই সকলের সঙ্গে। আমি জানি, সকলে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতেই আগ্রহী হয়। তাই সব জায়গাতেই তাদের সাপ্লাই ডিমান্ডকে মিট করতে পারে না। কিন্তু এটা আমার গল্প। আমি যা চাইব, এখানে তাই হবে। তাই আগে আমার সঙ্গে আলাপ, তারপর অণুর সঙ্গে আলাপ করানো হবে।

আমার নাম লালমোহন কাঞ্জিলাল। জানি, নামটা গল্পের প্রোটাগনিস্ট হওয়ার উপযুক্ত নয়। বড়জোর একটা সাইড-কিক হতে পারে! কিন্তু কী করব, এটাই আমার নাম! আসলে আমার ঠাকুরদার বাবার নাম ছিল লালমোহন। আমি জন্মানোর সময় ঠাকুরদা লক্ষ করেন যে, আমার পিছনে একটা নিউজিল্যান্ডের মতো দেখতে জড়ুল আছে। এমন নাকি ওঁর বাবার ইয়েতেও ছিল! তাই ঠাকুরদার দৃঢ় ধারণা হয় যে, আমি সেই বাবা লালমোহন! ফলে আমার নামকরণের ব্যাপারে কারও কোনও ওজর-আপত্তি ধোপে টেকেনি। কিন্তু এই নামটা আমার একদম পছন্দ নয়। লালমোহন তো ফেলুদার গল্পের কমিক ক্যারেক্টর। তা ছাড়া আমার ক্লাসের ছেলেদের কী সুন্দর সব নাম ছিল, সুধন্য, অয়নাংশু, তিলক, রাহুল। সেখানে আমি লালমোহন! যেন হাত থেকে থপ করে মাটিতে পড়ে যাওয়া রসগোল্লা! আমার এত রাগ হত না! ভগবানের উপর ছোটবেলায় সকলেরই একটা ভয়মেশানো সম্ভ্রম থাকে। স্কুলের রাগী হেডস্যারের মতো। আমারও ছিল। তবু ক্লাসে কেউ যদি আমার নামটা ছোট করে 'লালু' বলে ডাকত, যদি বলত, "লালু ছেলে আলু খায় ভাতে দিলে গলে যায়", তখন ব্যাপক মাথা গরম হয়ে যেত। তখন আর এসব সম্ভ্রম ফম্ভ্রম মানতাম না। বরং বলতাম, "হে ঠাকুর, পৃথিবীর পিছনে একটা নিউজিল্যান্ড সেঁটে দিয়েছ বলে কি আমার পিছনেও সেটা সাঁটতে হবে?" তারপর মনে হত ঠাকুরদা কী করে দেখল, তার বাবার নিউজিল্যান্ডটা? কারণ জায়গাটা তো বড়দের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধের নয়!

কিন্তু নাম ধরে দুয়ো দিয়ে কেউ আমার কনফিডেন্সকে টসকাতে পারেনি। ক্লাসে প্রথম পাঁচজনের মধ্যে র‍্যাঙ্ক করে সায়েন্স নিয়েই আমি এইচ এস পাশ করি। এমনকী, এরপর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংটাও লাগিয়ে দিয়েছিলাম জয়েন্টে। মায়ের খুব গর্ব ছিল আমায় নিয়ে। কিন্তু আমার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সুযোগ পাওয়াটা আর মা দেখে যেতে পারেনি। রেজাল্ট বেরোনোর আগের দিনই হঠাৎ মাথা ঘুরে মা পড়ে গিয়েছিল ছাদে। আর ওঠেনি!

আমাদের সকলেরই একটা পড়ে যাওয়ার গল্প থাকে। তারপর আবার উঠে দাঁড়ানোর গল্পও থাকে। আসলে এসএমএস আর নানারকম বিজ্ঞাপনের দৌলতে এসব কথা এখন আমরা জানি। কিন্তু আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন পরিস্থিতি এমন ছিল না। এমন ক্যাপসুলেটেড জ্ঞান তখনও এভাবে ওড়াউড়ি করত না চারিদিকে। মায়ের হঠাৎ মারা যাওয়াটা আমাকে একদম নাড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ, মায়ের সঙ্গেই ছিল আমার সারা জীবনের বন্ধুত্ব। বাবার সঙ্গে চিরকাল একটা দূরত্ব আছে আমার। যেন সেকেন্ড স্লিপ আর গালি! তার মধ্যে দিয়ে কত বল যে গলে বাউন্ডারি হয়ে গিয়েছে! পারতপক্ষে বাবা আমার সঙ্গে কথা বলত না। আমিও এড়িয়ে চলতাম মানুষটাকে। আমি যখন ছোট, তখন বাবা সবে ব্যাবসা শুরু করেছে। ফলে উদয়-অস্ত খাটত মানুষটা। আর চিরকাল দাদার দিকেই বাবার ঘুড়ি গোঁত্তা খেত বেশি! তাই দূরত্ব তৈরি করতে কসরত লাগেনি। আমার গোটা জগৎ ছিল মা-ময়। মা যেদিন মারা যায়, তার আগের দিন সন্ধেবেলা পর্যন্ত বসে আমরা লুডো খেলেছিলাম। আমি পরের দিনের রেজাল্ট নিয়ে টেনশন করছিলাম খুব। মা উলটে হাসছিল। আমায় বলছিল, ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। বলছিল, "দেখবি, ঠিক ভাল রেজাল্ট হবে।"

সেদিন অনেক রাতে ঘুমোতে গিয়েছিলাম। মা উঠত খুব ভোরে। সূর্য ওঠার আগে স্নান হয়ে যেত মায়ের। তারপর সারা বাড়িতে ঘুরে ঘুরে কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম জপ করত মা। কখনও কখনও আবছা ঘুমের ভেতর সেই গুঞ্জন শুনতাম আমি। সেদিনও কি শুনেছিলাম? মনে নেই। শুধু মনে আছে রান্নার মনুদির চিৎকার। দাদা আর বাবার দৌড়ে যাওয়া। আর আমার সামনে দুলে ওঠা সমস্ত জগৎ সংসার! মায়ের চোখটা অর্ধেক খোলা ছিল। হাতের মুঠোয় ধরা ছিল ছাদে লাগানো টগর। সেদিন হাওয়া বইছিল খুব। নীল আকাশে একটা কালো রঙের ফিঙেপাখিকে আমি দেখেছিলাম উড়ে চলে যাচ্ছে শেয়ালদার দিকে।

সেখান থেকে কি ও ট্রেন ধরবে? পাখিটা কি অনেক দূরে থাকে? ও কি মাকে নিয়ে গেল সঙ্গে করে? কোনও কোনও ঘটনা মানুষকে থামিয়ে দেয়। আবার কোনও কোনও ঘটনা মানুষকে পৌঁছে দেয় একটা ঢালের দিকে। মায়ের চলে যাওয়া আমায় গড়িয়ে দিয়েছিল। আমি আমার স্যান্ডো গেঞ্জিটাও কিনতাম না নিজে। কিন্তু তখন বুঝেছিলাম, এবার নিজের দাহটাও নিজেকে করতে হবে!

ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভরতি হয়ে হস্টেলে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে মন দিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম চার বছর। কোনওদিকে তাকাইনি। শুধু মনে হত, আমার নিজের পা-টা শক্ত করতে হবে। আমাদের নিজেদের সিভিল কনস্ট্রাকশনের ব্যাবসা। সেখানে আরামসে কাজ করতে পারি, কিন্তু আমার সবসময় মনে হত যে, নিজে কিছু করব। বাবার হাতের তলায় থাকব না। কেউ যদি খাটতে পারে মন দিয়ে, পৃথিবী তাকে খালি হাতে ফেরায় না। আমাকেও ফেরায়নি। মুম্বইয়ের একটা বড় কোম্পানির সিভিল ডিপার্টমেন্টে আমি সিলেক্টেড হয়ে যাই ক্যাম্পাস থেকে। ব্যস, আর কোনওদিকে তাকাইনি, চলে গিয়েছিলাম মুম্বই। আমাদের কোম্পানি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কোম্পানি। গোটা দেশে কাজ হত আমাদের। কোর সেক্টরে কাজ করার যে-মজা, তা আমার ভাল লাগত খুব। গোটা ওয়েস্ট জোনে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে হত। রাস্তা, বাঁধ, ব্রিজ, ফ্লাইওভার থেকে শুরু করে ওয়াটার সিস্টেম, পাওয়ার প্ল্যান্ট, অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ। মনে হত, আয়্যাম বিল্ডিং ইন্ডিয়া! বাড়িতে যাইনি প্রায় তিন বছর। দাদা শুধু পশ্চিম ভারতে কাজে এলে দেখা করে যেত। আমি কারও কথা জিজ্ঞেস করতাম না তেমন। কিন্তু দাদা নিজে থেকেই বলত। বলত, এসে ফ্যামিলি বিজনেস জয়েন করতে। আমি পাত্তা দিতাম না। মনে হত, যা পারি, একা করব। বাবার সঙ্গে কিছু করবই না।

বাবার সঙ্গে কী ছিল আমার? কোনও ঝামেলা ছিল কি? না, আমি তো মনে করতে পারি না যে, বাবা কোনওদিন আমায় সরাসরি খারাপ

কিছু বলেছে! না, বলেনি। কিন্তু সব তো আবার মুখেও বলতে হয় না। বাবার কথা না বলা, আমায় এড়িয়ে চলা, বাবার ডিসঅ্যাপ্রুভিং দৃষ্টি দিয়ে তাকানো, সবটাই কেমন যেন আমায় কষ্ট দিত। আমায় ঠেলে পাঠিয়ে দিত দূরে।

দাদা জিজ্ঞেস করত, "তুই আসিস না কেন রে বাড়িতে? আমার উপর রাগ করেছিস?"

"তোর উপর?" আমার হাসি পেত। আমার দাদা হরিৎ কাঞ্জিলাল পৃথিবীর সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। ইংরিজিতে এম এ করেছে। তারপর সরাসরি বাবার কথায় ঢুকেছে ব্যবসায়। এমন শান্ত, অমায়িক লোকের দ্বারা কি ব্যাবসা হয়? কে জানে? হয়তো হয়। পৃথিবীকে আমরা যতটা খারাপ ভাবি না কেন, আসলে ততটা খারাপ পৃথিবী হয়তো এখনও হয়ে ওঠেনি! দাদাকে বেশ অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল বাবা। বউদির নাম শ্রীনিকা। বলছি বউদি, আসলে আমি শ্রী বলে ডাকি। শ্রী পড়ত দাদার দু'ক্লাস নীচে। আমার এখনও মনে আছে, তখন আমি ফাইনাল ইয়ারে পড়ি। পুজোয় বাড়িতে এসে এক রাতে খেতে বসেছি। বাবা হঠাৎ দাদাকে বলল, "তোর এবার বিয়ে দেব।"

"মানে?" দাদা খুব চমকে গিয়ে তাকিয়েছিল বাবার দিকে!

বাবা গম্ভীর মুখে বলেছিল, "ইংরিজিতে এমএ করলে কি বাংলা ভুলে যেতে হয় আজকাল?"

"না তো", দাদা হকচকিয়ে গিয়েছিল একদম।

"তবে বাংলাটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে কোথায়?"

"না... মানে..." দাদা মনের ভিতর ডিকশনারি উলটাচ্ছিল প্রাণপণ। কিন্তু মানেটা যে কী, সেটা কিছুতেই বোঝাতে পারছিল না বাবাকে।

বাবা বলেছিল, "কাউকে ভাল লাগে তোর?"

"আমার?" দাদা তখনও ঘাবড়েছিল, "লাগে... এই পিসিমা, লাল, ছোটমাসি... মানে, অনেককেই ভাল লাগে..."

"ছাগল!" বাবা চাপা গলায় দাদাকে যেন ওর নাম মনে করিয়ে

দিয়েছিল। তারপর বলেছিল, "এদের সঙ্গে কি তোর বিয়ে দেব নাকি? বিয়ে করার মতো কাউকে ভাল লাগে?"

"অ্যাঁ?" দাদার হাত দিয়ে ভাত ঝুরঝুর করে পড়ে গিয়েছিল থালায়।

"লাগে কিনা বল। না হলে যাকে বলব, তাকে বিয়ে করতে হবে, বুঝেছিস?"

দাদা বেশ খানিকক্ষণ থালার দিকে তাকিয়ে মুখ চোখ লাল করে খুব আস্তে বলেছিল, "লাগে।"

"কাকে?" বাবা খাওয়া থামিয়ে স্থিরচোখে তাকিয়েছিল দাদার দিকে।

"শ্রীনিকা।"

"ব্রাহ্মণ?" বাবা অজগর যেভাবে খরগোশের ভাইটাল স্ট্যাটস মাপে, সেভাবে তাকিয়েছিল।

"মানে... পইতে তো..." দাদার মুখ-চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল।

"গাধা" বাবা দাদার আর একটা নাম মনে করিয়ে দিয়ে বলেছিল, "মেয়েরা পইতে পরে? সারনেম কী? জানিস?"

দাদা পাড়া বেপাড়ার থেকে সাহস ধার করে এনে বলেছিল, "বোধহয় মুখার্জি।"

"এমন বোধহয় কেন? এমন বোধটা হয় কেন? শিয়োর নোস?"

"আমার চেয়ে জুনিয়র। আমায় চেনে কিনা, কে জানে!"

"বাঃ", বাবার ভুরু কুঁচকে গিঁট পাকিয়ে গিয়েছিল কপালের মাঝখানে, "এতটা অপদার্থ হওয়াও কম অ্যাচিভমেন্ট নয়! কাল আমায় ডিটেল দিবি। আমি কথা বলে দেখছি। তবে যদি ব্রাহ্মণ না হয়, তবে আমার কাছে এসে নাকে কাঁদবি না, বুঝেছিস?"

দাদা, পুরনো বন্ধু ও ইউনিভার্সিটির কিছু জুনিয়রের সাহায্য নিয়ে সাতদিনের ভিতর বের করেছিল মেয়েটির ডিটেল।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এতদিন লাগল?"

দাদা লাজুক মুখে বলেছিল, "একে তো ছুটি চলছে। তার উপর

আমি কতদিন হল পাশ করে গিয়েছি। সময় তো লাগবেই। যদি এখনও স্টুডেন্ট থাকতাম, তবে এতটা সময় লাগত না।

আমি হেসে বলেছিলাম, "জানি, তাচ হলে মিনিমাম এক মাস লাগত!"

বাবা নিজেই মেয়ের বাড়ি গিয়ে বন্দোবস্ত করেছিল সব। দাদার বিয়ে হতে একটুও সমস্যা হয়নি। শুধু বাসরঘরে শ্রী-র বান্ধবীরা ইয়ারকি মেরে বলেছিল, "কী রে শ্রী? তুই না বলেছিলি, এই ক্যাবলাকান্তটাকে কোনওদিন বিয়ে করবি না। তবে?"

শ্রী ছদ্ম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, "করিনি তো। কিন্তু ও আমায় বিয়ে করলে আমি কী আর করব বল?"

বউয়ের গর্বে মুখে মেটাল লাইট জ্বলে উঠেছিল দাদার। আমায় কানে কানে বলেছিল, "তুইও ব্রাহ্মণ মেয়ে পছন্দ করিস। দেখবি কোনও হ্যাপা থাকবে না।"

আর সেখানেই তো ঠোক্কর খেল আমার গল্প! কারণ, সেই হ্যাপাটা না হলে এই গল্পটাও হত না।

আজ রবিবার। সকাল থেকেই মুখ ভার করে আছে আকাশ। বুঝলাম, শীতের কোনও সিন নেই। এই ঢ্যাঁটা মেঘ ঠেলে উত্তর কেন, দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিমেরও কোনও ঠান্ডা হাওয়ার সাধ্য নেই যে, মাথা গলায় কলকাতায়।

আমার ঘরটার মাথার কাছে একটা বড় কাচের জানলা আছে। সেটা দিয়ে বাগান, পাঁচিল আর রাস্তাটা স্পষ্ট দেখা যায়। বাগানে গাঁদাফুল লাগিয়েছেন কাকুরা। ও, সরি, বলা হয়নি, গত পরশু থেকে আজ অবধি আসতে আসতে নীতীশবাবু আর ওঁর স্ত্রী আমার কাকু কাকিমা হয়ে গিয়েছেন। আমি বানাইনি। নীতীশবাবুই বললেন যে, ওঁদের আমি আঙ্কল-আন্টি বলে ডাকতে পারি। তবে আমার আবার বেশি তেলমশলা সহ্য হয় না। তাই কাকু-কাকিমাটাই স্টু বলে মনে হল। তা বাগানটা ভালই করছেন কাকুরা। সকালে ঘুম থেকে উঠেই কমলা আর

হলুদের দাপাদাপিটা বেশ ভালই লাগছে। কাঁঠালচাঁপাটাও বেশ সুন্দর। এ ছাড়াও আরও কিছু ফুল আছে, কিন্তু সেগুলো দিয়ে তো পুজো হয় না তাই নাম জানি না। বালিশের পাশ থেকে মোবাইলটা তুলে সময় দেখলাম। সাড়ে ন'টা বাজে। দেরি হয়ে গিয়েছে উঠতে। এখানে তো শুনেছি ন'টা নাগাদ ব্রেকফাস্ট দিয়ে দেয়। আমি আধঘণ্টা লেট। তা হলে কি কপালে আর কিছু জুটবে?

আর সময় নষ্ট না করে বাথরুমের কাজ শেষ করে এসে হাফপ্যান্টটা পালটে একটা ট্র্যাকপ্যান্ট পরলাম। আর ঠিক তখনই বন্ধ দরজায় নক করা হল দু'বার।

দরজা খুলেই থমকে গেলাম, "আপনি?"

"হ্যাঁ, কাকু আর কাকিমা আপনার জন্য ওয়েট করছে ডাইনিং টেবিলে। চলে আসুন। এমনিতেই অনেক লেট করেছেন," অণু সিরিয়াস মুখ করে বলল।

দেখলাম, মেয়েটা ওর পেটেন্ট ড্রেসেই আছে। সেই একটা কটনের কাপ্রি আর ফুলহাতা হাই নেক টি-শার্ট। চুলটা আগোছাল করে ঘুরিয়ে একটা কাঁটা দিয়ে গাঁথা। এই ড্রেসটা কি ওর কবচকুণ্ডল টাইপের?

শুভা কাকিমাকে যে অল্প বয়সে খুব সুন্দর দেখতে ছিল, সেটা বলে দিতে হবে না। আমায় দেখেই বললেন, "আরে, আমি তো ভাবলাম, তুমি খাবেই না। তা নতুন জায়গায় অসুবিধে হচ্ছে না তো? তুমি কিন্তু বাড়িরই ছেলে এখন। সব খোলাখুলি বলবে।"

লজ্জা লাগল একটু। ভদ্রমহিলা গত দু'দিনে কম সে কম চোদ্দো বার জিজ্ঞেস করেছেন, আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা! বললাম, "না কাকিমা, আমার একটুও অসুবিধে হচ্ছে না।"

কাকিমা আমায় খাবার দিয়ে প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি এমন পাখির মতো খাও কেন বলো তো? এমনিতেই তো রোগা, এই বয়সের ছেলেরা কত খায়!"

আমি হাসলাম। এসব কথার তো আর কোনও উত্তর হয় না। এর জন্য একটা স্পেশ্যাল বোকা বোকা হাসি সব ছেলেরই তৈরি থাকে। আমারও আছে।

কাকিমা জিজ্ঞেস করলেন, "তা বাবা, মানিকতলায় নিজের বাড়ি থাকতে এমন করে পরের বাড়িতে এসে উঠলে কেন?"

প্রশ্নটা আচমকা ছিল, না আলুর দমের ঝাল বেশি ছিল, বুঝলাম না! কিন্তু একটা জোরদার বিষম খেয়ে জলের গ্লাস টাস উলটে একটা কেলেঙ্কারি করলাম নিমেষের মধ্যে।

কাকু আমার মাথায় থাবড়াতে থাবড়াতে কাকিমাকে বললেন, "তুমি চুপ করবে? এই তোমার পুলিশের জেরা শুরু হল। নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধে আছে, তাই এসেছে। তুমি একটু চুপ করো।"

বিষম যে খিদে নষ্ট করে দেয়, তা বেশ বুঝলাম। আর খেতে ইচ্ছে করল না। কিন্তু খাবার ফেলাটা আমার ধাতে নেই। তাই কোনওমতে খেতে লাগলাম।

"এখন ঠিক আছ তো?" কাকিমা পরম আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি মাথা নাড়লাম। তবে এমন করে, যাতে বোঝা যায় যে, মুখে বলছি ঠিক আছি, কিন্তু আসলে খুব খারাপ অবস্থা! ডাক্তার দেখলে হয়তো জবাবই দিয়ে দিতেন।

তবে কাকিমা বুঝলেন না। বরং পরের প্রশ্নটা করলেন, "তোমরা কি ঘটি?"

"ঘটি? মানে?" বুঝতে পারলাম না ঠিক।

"আরে, পশ্চিমবঙ্গের লোক কি?"

"কেন বলুন তো?" অবাক হলাম বেশ।

"ঘটিরা শুনেছি বেশি ঝাল খেতে পারে না। তাই জিজ্ঞেস করলাম। বিষম খেলে কিনা!"

আমি কিছু বলতে গিয়েও হাসলাম। তারপর মাথা নেড়ে বললাম,

"নর্থে থাকি মানেই ঘটি নই। আমরা খাস বাঙাল। ইস্টবেঙ্গল হারলে একসময় বাড়িতে অরন্ধন হত! তবে আমি ঝাল খেতে পারি না একদম। আসলে, ব্যাপারটা হচ্ছে..."

অণু আমায় থামিয়ে দিল হঠাৎ, বলল, "চুপ করে খান, নইলে আবার বিষম খাবেন!"

হেসে খাওয়ায় মন দিতে গেলাম, কিন্তু তখনই পিকপিক করে প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইলটা ডেকে উঠল। টোন শুনেই বুঝলাম, কে ফোন করেছে। মুডটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। গতকাল সারাদিন কথা হয়নি। একবারও ওর মনে পড়েনি আমায় ফোন করার কথা। বরং যতবার ফোন করেছি, দেখেছি, ওর মোবাইলটা সুইচ্‌ড অফ আছে। ও কী পেয়েছে? আমি ঘর থেকে ইয়ারকি মারতে বেরিয়ে এসেছি?

আমি বাঁ হাত দিয়ে ফোনটা বের করে, 'এক্সকিউজ মি' বলে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে সেই ছ'টা সিঁড়ির ধাপে এসে দাঁড়ালাম। তারপর ফোনটা কানে নিয়ে আস্তে বললাম, "হ্যাঁ, বলো।"

"হাই সুইটি? হোয়াটস আপ?" মিকির গলাটা উইন্ড চাইমের মতো রিনঠিন করে উঠল, "হোপ ইউ আর হ্যাভিং ফান, রাইট?"

আমি দূরে ডাইনিং টেবিলে বসে থাকা অচেনা মানুষগুলোকে দেখলাম। টেবিলের ওই ঝাল তরকারি দেখলাম। এই অচেনা বাড়িঘর দেখলাম। তারপর ভাবলাম, এভাবে কি ফান হ্যাভ করা যায়?

তিন

লোক হিসেবে গুপ্তসাহেব খুব ভাল। দোষের মধ্যে একটাই, প্যানিক করেন ভীষণ! এই পোদ্দার কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্টের কি এতটা টেনশনগ্রস্ত হলে চলে?

টিফিন আওয়ার্সে বসে একটা ফিল্ম ম্যাগাজিনের পাতা উলটাচ্ছিলাম।

সেটা দেখে উনি আমায় ওঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়ে সে কী বকাবকি করলেন! যেন ক্লাসের ভিতরে লুকিয়ে হলুদ বই দেখছি! তখন থেকে মাথাটা গরম হয়ে আছে। কাজই করতে ইচ্ছে করছে না। এখন আমাদের যে পাঁচ-ছ'টা প্রোজেক্ট চলছে, তার ভিতরে আমায় দুটো প্রোজেক্টের ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরি করতে দিয়েছেন উনি। দুটোই বছরদেড়েকের পুরনো কাজ। একটা গঙ্গার উপর দোতলা ব্রিজ আর একটা নর্থ ইস্টের একটা এক্সপ্রেস ওয়ে। দুটোর সব হিসেবপত্রই আছে। কিন্তু তাও কোম্পানির মালিক মিস্টার পোদ্দার একবার নতুন করে ইভ্যালুয়েশন করতে চান। কারণ, সিমেন্ট আর লোহার দাম আচমকা খুব বেড়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে তেলের দামও বেড়েছে হঠাৎ। ফলে প্রোজেক্ট কস্টও বেড়ে গিয়েছে।

সারাদিন এই হিসেবপত্র করতে করতে হাঁপিয়ে গিয়ে একটু সালমা হায়েকের ছবি দেখছিলাম, কিন্তু গুপ্তসাহেব এমন ঝাড় দিলেন যে, মুডটারই বারোটা বেজে গেল! এখন অন্ধকার হয়ে গেলেও মোবাইল জানাচ্ছে, মোটে ছ'টা বাজে। আজ পাঁচটার সময় বেরিয়ে পড়েছি অফিস থেকে। তারপর সারা কলকাতা টপকে এসে দাঁড়িয়েছি এই শপিং মলের সামনে। তা প্রায় পনেরো মিনিট হল মোটরবাইকটা পার্ক করে মলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নানা মাপের ছেলেমেয়েদের দেখছি। কিন্তু যাকে দেখতে চাইছি, তাকে এখনও দেখতে পাচ্ছি না।

গত পনেরো মিনিটে চারবার মিকিকে ফোন করেছি। প্রতিবারই ও বলেছে, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু গত পনেরো মিনিট ধরেও সেই পাঁচ মিনিট আর কিছুতেই হচ্ছে না!

মিকির পুরো নাম কুসুমিকা বাসু। মধ্য কলকাতার একটা নামকরা কলেজে কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়ে, সেকেন্ড ইয়ারে। মিকি বেশ লম্বা, স্লিম। গায়ের রং গরম বালির মতো। আর চোখটা যামিনী রায়ের ছবি থেকে কপিরাইটের তোয়াক্কা না করেই কাট-পেস্ট করা। আমার বয়স তিরিশ আর মিকি জাস্ট কুড়ি। এক দশকের ছোট একটা মেয়ের সঙ্গে

প্রেম করা খুব সহজ কাজ নয়। মিকির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে গত বছর। দু'বছর আগে আমি কলকাতায় চলে এসেছিলাম আমাদের ব্যবসায় যোগ দিতে। শুনে আশ্চর্য লাগছে না? আমি আসতাম না, কিন্তু পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, বাধ্য হয়েছিলাম আসতে। আর হ্যাঁ, এখানেও কারণটা সেই বাবা!

একদিন সকালে হঠাৎই দাদার ফোন এসেছিল। আমি তখন পুনেতে। দাদা ভাল করে কথা বলতে পারছিল না, শুধু কাঁদছিল। তখন শ্রী দাদার হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিয়ে সংক্ষেপে বলেছিল যে, বাবার সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। আইসিসিইউ-তে ভরতি। আমি যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসি। খবরটা শুনে বেশ নড়ে গিয়েছিলাম ভিতরে ভিতরে। বাবা আমায় যা-ই বলুক, কিন্তু এমন এনার্জেটিক মানুষ আমি সারা জীবনে বিশেষ দেখিনি। আর জ্ঞানত মনে পড়ে না যে, কোনওদিন বাবাকে অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি! সেই মানুষটা কিনা একদম আইসিসিইউ-তে ভরতি! সেদিন ফোনটা কেটে দিয়ে বুঝেছিলাম যে, আমরা যত বড়ই হই আর আমাদের সঙ্গে আমাদের বাবাদের যেমনই সম্পর্ক থাকুক না কেন, আমাদের অবচেতনে বাবারাই হল, স্পাইডারম্যান, ব্যাটম্যান আর অরণ্যদেবের ককটেল! এরা বিছানা নিয়েছে শুনলে সবারই পায়ের তলার জমি নড়ে যায়! সময় নষ্ট না করে ফার্স্ট অ্যাভেলেভেল ফ্লাইট ধরে কলকাতায় ফিরেছিলাম।

বিস্তর টানা-হ্যাঁচড়ার পরে বাইপাস অপারেশন হয়েছিল বাবার। ডাক্তার বলেছিলেন, "এবার থেকে কাজের প্রেশার একটু কম নেবেন মিস্টার কাঞ্জিলাল।"

বাবা ধীর গলায় কেটে কেটে বলেছিল, "কিন্তু আমার ব্যাবসার কী হবে? সেখানে যারা কাজ করে, তাদের কী হবে? আমার দুটো হাতের একটা তো কাটা!"

কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে কথাটা শুনেছিলাম। বাবা জানত না যে, আমি দাঁড়িয়ে আছি বাইরে। তাই কথাটা যে আমায় খোঁচা দিয়ে বলার

জন্য বলা নয়, সেটা বুঝেছিলাম। বাবার গলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যে, মনে হয়েছিল বুকের পাঁজরটা হঠাৎ ছোট হয়ে চেপে বসেছে ফুসফুসে! শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল খুব। মনে পড়ছিল, একবার মা বলেছিল, "তুই যে-মানুষটাকে এমন করে অবহেলা করিস, তাকে কিন্তু আমি ভালবাসি। আমার সামনে ওর সম্বন্ধে খারাপ কিছু বলবি না।"

আমি জানি, মা থাকলে আমায় এমন সময় কী করতে বলত। তাই আমি সেই রাতে নিজেই দাদাকে বলেছিলাম, "চাকরিটা ছেড়ে দেব রে দাদা।"

"সে কী!" দাদা চমকে উঠেছিল, "তবে? কী করবি?"

"ব্যাবসা," গম্ভীর গলায় বলেছিলাম।

"কার সঙ্গে?"

"তোদের সঙ্গে। কেন? নিবি না তোদের টিমে?"

"লাল, এমন ইয়ারকি করিস না! বাবার শরীর ভাল নেই, ফালতু এসব বলিস না," দাদার গলায় সামান্য রাগ দেখতে পেয়েছিলাম।

"আয়্যাম ডেড সিরিয়াস," দাদার চোখে চোখ রেখেছিলাম।

দাদা হাঁ করে তাকিয়েছিল আমার দিকে! যেন বুঝতে পারছিল না, আমি কী বলছি।

শ্রী হাসিমুখে বলেছিল, "সত্যি লাল? তুমি জয়েন করবে?"

"হ্যাঁ," দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম, "আমি চাই, বাবার দুটো হাতই থাকুক!"

কিন্তু এখন বাবার ক'টা হাত আছে? একটা হাত কে কেটে নিয়ে গিয়েছে? গব্বর সিং? না... মোবাইলে দেখলাম, কুড়ি মিনিট হয়ে গিয়েছে। বাবার কাটা হাতটা একা-একা দাঁড়িয়ে আছে রাক্ষসের হাঁ-এর সামনে! কোথায় মিকি?

এমনই একটা মলের সামনে আমার সঙ্গে মিকির দেখা হয়েছিল প্রায় একবছর আগে। আমি এক ক্লায়েন্টকে নিয়ে এসেছিলাম সল্টলেকের

এই মলটার রেস্তরাঁয় ডিনার করাতে। সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল বেশ। ক্লায়েন্ট শপিং করেছিল প্রচুর। তারপর ডিনার করে কাছের যে-হোটেলে সে উঠেছিল, সেখানে চলে গিয়েছিল। আমাদের গাড়িটাই পৌঁছে দিয়েছিল ওকে। আমি আর যাইনি। কয়েকটা ডিভিডি কিনব বলে ঘুরছিলাম মলে। কথা ছিল, ভদ্রলোককে পৌঁছে দিয়ে গাড়িটা ফিরে আসবে আমায় পিক-আপ করতে। এসময় ঘুরতে ঘুরতে দেখেছিলাম মিকিকে। একা একটা দোকানের শেডের তলায় দাঁড়িয়ে খুব অধৈর্য হয়ে ঘড়ি দেখছে। কখনও-কখনও হয় না, ট্রেনের হাতল ধরতে গেলে আর তোমার হাতে সেখানে আটকে রাখা চুইংগাম আটকে গেল, শত চেষ্টা করেও তুমি তা ছাড়াতে পারলে না হাত থেকে! যতই ছাড়াতে চেষ্টা করছ, ততই তা জড়িয়ে যাচ্ছে এক হাত থেকে অন্য হাতে... আমারও ঠিক সেই দশা হয়েছিল! বুঝতে পারছিলাম যে, এভাবে কোনও ভদ্রলোক কোনও মেয়েকে দেখে না। কিন্তু যতই মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, ততই যেন আমার দৃষ্টি জড়িয়ে যাচ্ছিল মেয়েটার ওই পাইরেটেড চোখে! আর মেয়েটার ভিতর ভয় আর অসহায়তার এমন একটা মিশ্রণ কাজ করছিল যে, আমার মনে হচ্ছিল, বুক দিয়ে ওকে বাঁচাই! হ্যাঁ, ব্যাপারটা যাত্রা-যাত্রা শোনাল হয়তো, কিন্তু সত্যিই বলছি, এমনই মনে হয়েছিল।

গত বছর পর্যন্ত, মানে আমার সেই উনত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত, প্রেমে পড়ার মতো সুযোগ হয়নি। সারাজীবন নিজে কিছু করে দেখানোর চেষ্টায় এই চ্যাপ্টারটা বাদ পড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া ওটাকে চিরকাল একসেস অফ লাইফ মনে হয়েছে। আমার বন্ধু-বান্ধবদের অবস্থা তো দেখেছি! হেঁচে, কেঁদে, মনখারাপ করে, মদ খেয়ে, ডিপ্রেশনে পড়ে তাদের হালত খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয়েছে, এ কেমন জিনিস রে ভাই? সাধ করে এত কষ্ট পাওয়ার মানেটা কী? তাই সবসময় মনে হয়েছে, ঝাড়ের বাঁশ ঝাড়েই রাখা উচিত। কিন্তু অমন তুমুল বৃষ্টির ভিতরে আবছা কাচের ওপার থেকে মিকিকে দেখে আমার মনের ভিতর কেমন যেন বুদবুদ উঠেছিল! শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই

মুহূর্তটার মতো কিছু আর কোনওদিন আসেনি জীবনে। বেশ বুঝতে পারছিলাম, জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টারটা এতদিন বোকার মতো বাদ দিয়ে এসেছি! বুঝতে পারছিলাম, আজ পরীক্ষার সময় তাই ফেল করা ছাত্রের মতো বসে বসে আমায় পেন চিবোতে হচ্ছে!

লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট আর ভূত হল একই জিনিস! যে এক্সপিরিয়েন্স করেছে, সে বিশ্বাস করে। আর যে করেনি, সে যুক্তিবাদী হয়ে যায়! আমি সেই রাতের মুখটায়, বৃষ্টিভেজা কাচের আড়াল থেকে মিকিকে দেখে বুঝেছিলাম, আমি ভূত দেখেছি! আচ্ছা, প্রেমে পড়া বলে কেন? পড়ে গেলে ব্যথা লাগে বলে? আমিও ব্যথা টের পেয়েছিলাম। সম্পূর্ণ অচেনা একটা মেয়েকে ওইটুকু সময় দেখেই আমার যে কী কষ্ট হয়েছিল! ঠিক করেছিলাম, কথা বলব। যা থাকে কপালে। বড়জোর কী হবে, কথা বলবে না, এই তো?

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে একটু হেঁটে, একটু দৌড়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম ওর কাছে। তারপর খুব ভদ্র গলায় বলেছিলাম, "হাই, আয়্যাম লাল। আর ইউ ইন ট্রাবল?"

ও অপ্রস্তুত গলায় বলেছিল, "কেন বলুন তো?"

"ডোন্ট বি আফ্রেড। আমি ভদ্রবাড়ির ছেলে। মানিকতলায় থাকি। এখানে ব্যাবসার কাজে এসেছিলাম। অনেকক্ষণ থেকে দেখছি, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। আর যা বৃষ্টি... তাই ভাবলাম আপনাকে জিজ্ঞেস করি। আজকাল কোনও জায়গায়ই তো আর সেফ নয়।"

ও আমার দিকে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ। আমার হাত-পায়ের নাটবোল্ট ঢিলে হয়ে যাচ্ছিল সব! অমন চোখ সত্যি দেখিনি কোনওদিন! আমার ব্যথা লাগছিল। ভীষণ ব্যথা লাগছিল। সারাজীবনের জমে থাকা প্রেম আমার বুকের ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল!

মিকি শান্ত গলায় বলেছিল, "আমার নাম কুসুমিকা বাসু। কলেজে পড়ি। এখানে এসেছিলাম ঘুরতে। বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যায়। ওরা রাগ করে আমায় ফেলে রেখে চলে গিয়েছে। আমিও তখন

রাগ দেখিয়েছি। কিন্তু এখন যে কী বিপদে পড়েছি! এদিকে আমার সেলফোনটার ব্যাটারিটাও শেষ। ফলে আয়্যাম স্ট্র্যান্ডেড!"

"আমি আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি!" আরও শান্ত গলায় বলেছিলাম।

"আপনি?" মিকি তাকিয়েছিল আবার।

"আপনার কোনও ভয় নেই।"

"ভয়?" মিকি সাহস দেখিয়ে জোর করে হেসেছিল, "পুলিশ কমিশনার আমার নিজের কাকু। বাবার ভাই। আমার ভয় পাওয়ার কী আছে?"

হেসে বলেছিলাম, "আমার গাড়ি এতক্ষণে এসে গিয়েছে। আপনি কোথায় থাকেন?"

"বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে," মিকি বলেছিল।

"চলুন তবে। ভয় নেই, আপনার কমিশনার কাকুকে ডিস্টার্ব করতে হবে না। আপনি পিছনে বসবেন, আমি সামনে সিটে বসছি।"

বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে এসে মিকিকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, "আপনার কাছ থেকে আজ নতুন একটা জিনিস শিখলাম।"

"আমার কাছ থেকে?" মিকি অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

হেসে বলেছিলাম, "পুলিশ কমিশনার তো চক্রবর্তী। তা বাসু আর চক্রবর্তী যে আপন ভাই হয়, তা আপনি বেশ জানিয়ে দিলেন!"

মিকি ভুরু কুঁচকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল আমার দিকে। তারপর বলেছিল, "আপনার মোবাইল নম্বরটা দিন তো।"

"আমার?" আমি অবাক হয়েছিলাম।

"হ্যাঁ আপনার। আপত্তি আছে?"

সেই রাতেই প্রায় একটার সময় মেসেজ করেছিল মিকি: "আয়্যাম গোয়িং টু বি নাইন্টিন। ডোন্ট ইউ থিঙ্ক, ইউ আর টু ওল্ড ফর মি?"

আমি লিখেছিলাম: "এজ ইজ আ কনসেপ্ট। বাট রিলেশন গোজ ফার বিয়ন্ড ইট।"

ফোনটা পিকপিক করে নড়ে চড়ে ডেকে উঠল পকেটে। কে ফোন করল? মিকি? এতক্ষণ তো উত্তরই দিচ্ছিল না! তাড়াতাড়ি ফোনটা বের করলাম। আর খারাপ মুডটা আরও বিগড়ে গেল। কারণ গুপ্তসাহেবের ফোন। আমি দাঁতে দাঁত চেপে ফোনটা ধরলাম, "হ্যাঁ, স্যার।"

"তুমি আমায় মারবে?" গুপ্তসাহেব ওই প্রান্তে হইহই করে উঠলেন।

এই লোকটার ওপেনিং স্টেটমেন্টটা বরাবর এরকম হয়! আমি কেন মারব ওঁকে? আমার কি এর চেয়ে ভাল কোনও কাজ করার নেই?

"কেন স্যার, কী হল? আমি তো আমার কাজটা করছি। একটা প্রোজেক্ট শেষ হয়ে গিয়েছে। অন্যটারও প্রায় থ্রি-ফোর্থ হয়ে গিয়েছে। আর জাস্ট দু'দিন লাগবে।"

"আরে গুলি মারো তোমার কাজ। আমার যে শিয়রে সংক্রান্তি!"

"কেন?" বুঝতে পারলাম না যে, অফিস থেকে বেরোনোর সময় তো ঠিকই ছিল সব। এই সময়ের মধ্যে আবার কী হল?

গুপ্তসাহেব বললেন, "আরে, ফলতার ওই প্রোজেক্টটার জন্য যে-জার্মান কোম্পানির সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চার করছি আমরা, তার জন্য ওদের একজন টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পরশু আসবেন কলকাতায়।"

"তা তো জানি স্যার," আমি বললাম, "কিন্তু তার জন্য তো রায়দা আছেন অফিসে।"

"ওর নাকি জ্বর হয়েছে। ওর তো একটা না-একটা লেগেই আছে। একটা সপ্তাহ ও গোটা অফিস করে কখনও? এত কামাই করে যে, আমার মনে হয়, ও শাহরুখ খান!"

"জ্বর হয়েছে?" কী বলব বুঝতে পারলাম না।

"তোমায় যেতে হবে। পোদ্দারসাহেবের হুকুম হয়েছে।"

"আমায়? পরশু?"

"সমস্যা কোথায়?" গুপ্তসাহের চিৎকার করলেন, "এই বুড়ো বয়সে কি আমি মাঝরাতে এয়ারপোর্ট থেকে ওকে রিসিভ করব? আমার বউ আমাকে আস্ত রাখবে?"

ভাবলাম বলি, আমার প্রেমিকা কি আমায় আস্ত রাখবে? পরশুর পরের দিন ওর জন্মদিন। ছুটি নেওয়ার ধান্দা ছিল আমার। কিন্তু এখন আর তার উপায় নেই। এ কথাটা যদি মিকি শোনে, আমায় জল ছাড়াই গিলে নেবে!

"কী হল? থম মেরে গেলে কেন?" গুপ্তসাহেব ফালতু ফোনে কথা বলছেন। এমন চিৎকার করছেন যে, ফোন ছাড়া বললেও আমি শুনতে পেতাম!

"আমি না বললে আপনি শুনবেন?" বিরক্তিটা লুকোলাম না।

"তুমি আমায় মারবেই! তোমায় আমিই মাথায় তুলেছি!" মনে হল আমি ছাড়াও আশেপাশের সবাই ওঁর কথা শুনতে পাবেন!

"রাগছেন কেন? আমি কি যাব না বলেছি?" ফোঁস করে শ্বাস ফেললাম।

গুপ্তসাহেব নরম হলেন এবার, "জানি, চাপ হচ্ছে। কিন্তু কী করবে বলো? তুমি তো ভাল ছেলে!"

ফোনটা রেখে তেতো মুখে মোবাইলে সময় দেখলাম। আধঘণ্টা হয়ে গেল। কোথাও মিকির দেখা নেই। মেয়েটা কি আসবে না? তবে ফোন করে বলছে না কেন? ফোনটা ধরছে না পর্যন্ত। কোনও বিপদ হয়নি তো?

"আরে আপনি?" আমি থতমত খেয়ে পিছনে ফিরলাম। দেখলাম, অণু!

"তুমি... সরি আপনি এখানে?" নিজেই 'তুমি' বলে ফেলে লজ্জা পেলাম একটু।

"তুমি ইজ ফাইন। আমারও তাই ভাল লাগে। আপনিটা এই জেনারেশনের সঙ্গে ঠিক যেন যায় না," অণু উজ্জ্বলভাবে হাসল। তারপর ওর পাশে দাঁড়ানো ছেলেটাকে দেখিয়ে বলল,"মিট মাই কোলিগ, নিলয়। আর নিলয়, এ হল লালমোহন।"

"গ্রেট!" নিলয় হাসল, "একদম লাল আর নীল!"

আমিও কাঠের তৈরি একটা হাসি খুঁজে পেতে বের করলাম মনের ভিতর থেকে। মিকিটা যে কী করে না! ওই তো বলল আসতে। কী সব নাকি কিনবে! আর এখন দেখো, নিজেরই পাত্তা নেই! আর কতক্ষণ ওয়েট করব?

নিলয় বলল, "আমি নিলয় বণিক। আপনি?"

"লালমোহন কাঞ্জিলাল," সংক্ষেপে বললাম। বেশি কথা বললেই মুখ থেকে কোনও বাজে কথা বেরিয়ে যেতে পারে। মাথা পুরো ফর্টি নাইন হয়ে আছে! অণুকে এখনই আসতে হল? আমি চাই না, মিকির সঙ্গে ও আমায় দেখুক।

আসলে এক বাড়িতে থাকলেও অণুকে আমি এড়িয়ে চলি। যে পাঁচ-ছ'দিন আমি এখানে এসেছি, সে ক'দিন যতটা পেরেছি, অণুর থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছি। বাড়িতে একটু রাত করে ফিরে খাবার খেয়েই নিজের ঘরে ঢুকে যাই। ল্যাপটপে গেমস খেলি, মুভি দেখি বা বই পড়ি। এর বাইরে কিছু করি না। অণুর পুরো নামটাও ঠিক জানি না। তবে মেয়েটাও বিশেষ কথা টথা বলতে আসে না।

"লালমোহন কাঞ্জিলাল?" নিলয় চওড়া করে হাসল, "আগেও লাল, পরেও লাল! একদম লালে লাল! আপনি বাই এনি চান্স লালবাজারে কাজ করেন?"

মনে হল, হাতের উলটো পিঠ দিয়ে ঘুরিয়ে কানের গোড়ায় দিই ওকে! লাল কাকে বলে, আয়নায় দেখতে পাবে! অচেনা লোকজন ইয়ারকি করলে ভাল লাগে না মোটেও। তার উপর এমন জ্যাকেটের চেনখোলা, ছেঁড়া জিন্‌স পরা আর "সব তো জেনেই গেছি" টাইপ মানুষ আমার একদম ফালতু লাগে। তাই কিছু না বলে 'বোর হচ্ছি' এমন চোখে তাকালাম ওর দিকে।

"সরি!" নিলয় থমকালেও যেন কিছুই হয়নি এমন মুখ করে হাসল, "আই ওয়াজ ট্রাইং টু টিকল ইয়োর ফানি বোন।"

অণু পরিস্থিতি সামলাতে না বিগড়োতে কী জানি ফস করে বলল, "বাট

আই গেস, ইট ওয়াজন্ট দেয়ার!" তারপর নিলয়কে ধমক দিল, "সবার সেন্স অফ হিউমার থাকে না নিলয়। আর উনি একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে চাকরি করেন। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ইট, বালি, স্টোনচিপ নিয়ে কাজ।"

কথার ভিতরে 'চিপ' শব্দটায় এমন জোর দিল যে, কানে লাগল খট করে। এরা কী করছে এখানে? আমার পিছনে লাগতে এসেছে?

অণু আবার বলল, "যাক গে, মনে হচ্ছে, তুমি কারও জন্য ওয়েট করছ। বাই দেন!"

দেখলাম, অণু নিলয়ের হাত ধরে হেঁটে মলের দিকে চলে গেল। ওদের থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আবার রাস্তার দিকে তাকাতেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল আমার! মিকি একটা গাড়ি থেকে নামছে। গাড়িটা ছোট্ট, লাল। মিকি সামনের জানলা দিয়ে ঝুঁকে ছেলেটার সঙ্গে কিছু বলছে আর হাসছে।

কার গাড়িতে এল মিকি? কার সঙ্গে ছিল ও যে, আমার ফোন ধরেনি? আমায় অপেক্ষা করাল এতটা? আমার মাথার রক্ত ভাতের মতো ফুটতে লাগল। এসব কী হচ্ছে চারপাশে? আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম ঘুম থেকে? মনে পড়ল, আমি আমারই মুখ প্রথম দেখেছিলাম, ব্রাশ করতে গিয়ে।

চার

"আমায় একটু থাকতে দিবি?" পটাই করুণ মুখ করে তাকাল আমার দিকে।

"তোকে?" খাটের তলা থেকে জুতোটা বের করে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"না তো কে? পাড়ার ওই পানওয়ালাটাকে!" ঝাঁঝিয়ে উঠল পটাই।

আমি হাসলাম, "যাক, দশ মিনিট পরে অন্তত একটা কথা তো বললি!"

পটাই ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে শরীরের অর্ধেক মাটিতে রেখে বাকি অর্ধেকটা খাটে ফেলে দিল। আর আমার পেটরোগা কবির মতো খাট অমন বপুর আঘাতে কাঁই কাঁই করে উঠল একেবারে।

আজ খাটনি গিয়েছে খুব। জার্মানির সেই ভদ্রলোককে গত রাতে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে আজ সকালে নিয়ে ফলতায় সাইট দেখাতে যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে আবার সেক্টর ফাইভে পৌঁছে, মিটিং সেরে আটটা নাগাদ ফিরেছি বাড়িতে। তারপর হুড়োহুড়ি করে রেডি হয়েছি নেমন্তন্নে যাওয়ার জন্য। পার্ক স্ট্রিটে যেতে হবে। মিকি পার্টি দিচ্ছে ওর জন্মদিন উপলক্ষে।

এই ব্যাপারটায় আমার আপত্তি ছিল। গত বছর ওর উনিশতম জন্মদিনে আমি আর ও, দু'জনে ডিনার করেছিলাম বাইরে। ইচ্ছে ছিল, এবারও তাই হোক। কিন্তু সেদিন মলে ওর সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র ও এই নতুন প্ল্যানটার কথা জানিয়েছিল।

আমি অবশ্য তা নিয়ে উত্তর দিইনি। বরং ভুরু কুঁচকে পালটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তোমার সঙ্গে ওই ছেলেটা কে ছিল?"

"কোন ছেলেটা?" মিকি চুইংগাম চিবোতে চিবোতে ওর টাইট টপটাকে টেনে কোমরের ফাঁকা জায়গাটা ঢাকার চেষ্টা করছিল।

"যার গাড়িতে এলে। কে ছিল সে?"

"ওটা?" মিকি এমন মুখ করেছিল যেন ছারপোকার কথা জিজ্ঞেস করছি, "ও তো স্যাম।"

"স্যাম?" আমি অবাক হয়েছিলাম, "সে কে আবার?"

"আরে আমাদের কোচিং যে-বাড়িতে হয়, তার মালিকের ছেলে। পুরো নাম শমীক রয়। গ্রেট গাই।"

"তাই?" আমার মনে হচ্ছিল, কেউ বুকের ভিতর বসে ক্যাম্পফায়ারের আগুন জ্বালিয়েছে আমার পাঁজরগুলো নিয়ে, "গ্রেট গাই? তা আমার ফোন ধরছিলে না কেন তুমি?"

"ওটা সাইলেন্টে ছিল। আর ফোন করার কী আছে? দেরি তো হতেই পারে।" মিকি শ্রাগ করেছিল।

"দেরি হতেই পারে?" রাগ করব কী, ওর হাবভাব দেখে অবাক হচ্ছিলাম!

"হ্যাঁ," হেসেছিল মিকি, "এখন শোনো না, স্যাম কী বলল! বলে কিনা আমায় বার্থ ডে-তে ট্রিট দিতে হবে। তাই ঠিক করলাম, পার্ক স্ট্রিটে খাওয়াব এবার। চার-পাঁচজন বন্ধু থাকবে।"

"সে কী? তোমায় যে বলেছিলাম, আমরা রাতে একসঙ্গে খাব!" ভুলেই গিয়েছিলাম যে, প্ল্যানটা জার্মান ব্যাটার জন্য ক্যানসেলও হতে পারে!

"সেটা শেলভ্ড হয়েছে," মিকি এমন করে বলেছিল যেন কোনও ফিল্ম প্রোডিউসর কোনও রিপোর্টারকে তার ফিল্ম হচ্ছে না, এমন খবর দিচ্ছে!

"মানে? তুমি একাই ডিসিশন নিয়ে নিলে?"

মিকি এবার আমার দিকে সটান তাকিয়েছিল, "আমার বার্থ ডে-তে কী হবে, সেটা তবে কে ডিসাইড করবে?"

মাথা নিচু করে নিয়েছিলাম। মিকিকে কেমন যেন অচেনা লাগছিল! মনে হচ্ছিল, নতুন কোনও মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। নরম গলায় বলেছিলাম, "এমন কেন করছ সোনা? তুমি জানো তো কেমন অবস্থায় আছি আমি। গত কয়েকদিনের মধ্যে লাস্ট রবিবার একবার ফোন করলে, তারপর আজ সকালে আবার ফোন করলে। কেন এমন ছেড়ে ছেড়ে থাকছ? কেন এমন সরে যাচ্ছ? আমি কী করেছি?"

"কই? কিছু না তো!" মিকি চোয়াল নাড়াতে নাড়াতে পাশ দিয়ে যাওয়া দুটো শ্যাম্পু করা উটের মতো ছেলেকে মেপেছিল। আর দেখেছিলাম, ছেলে দুটো সটান মিকির টপের উপর দিয়ে জেগে থাকা এক দুটোকে চোখ দিয়ে ছুঁয়ে দিয়েছিল।

"তোমার ঠান্ডা লাগছে না? এটা ডিসেম্বর না মে?" আমি কড়া গলায় বলেছিলাম।

মিকি হেসে আমার হাতে হাত রেখে বলেছিল, "চিল, চিল! এত এক্সাইটেড হচ্ছ কেন? ডোন্ট অ্যাক্ট লাইক অ্যান ওল্ড ম্যান।"

ওল্ড ম্যান? আমার তিরিশ বছর বয়স। তাতেই ওল্ড ম্যান? দশ বছরের ছোট মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলে কি এসব শুনতে হয়? আমার ঠাকুরদা শুনেছি কুড়ি বছরের বড় ছিল ঠাকুরমার থেকে। কই বুড়ো বয়স অবধি তো ঠাকুরমার কাছে শুনেছি, "তোদের ঠাকুরদার মতো জোয়ান আমি কোনওদিন দেখিনি।" আর আমি তিরিশেই বুড়ো! কী বলতে চাইছে মিকি? মুখ গোঁজ করে ওর পাশে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। গত এক সপ্তাহ ধরে মিকি কেমন যেন অদ্ভুত ব্যবহার করছে আমার সঙ্গে। কেমন যেন ছাড়া ছাড়া, ছানাকাটা ব্যবহার। ভাল লাগছিল না আমার। আসলে আমার পাঁচটা সেন্স কাজ করে না ভাল। কিন্তু ছ'নম্বর সেন্সটা খুব খাটে। সেই আমায় বলছিল, কোথাও একটা সুর লাগছে না। এ মিকি যেন অন্য মিকি!

মলে ঢুকে মিলি ক্যাজুয়ালি বলেছিল, "তা তুমি কি যাবে?"

"কোথায়?" অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম একটু।

"পার্টিতে, সিলি! বললাম না, পার্ক স্ট্রিটে খাওয়াব। আসবে তুমি?"

আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না।! আমিই তো প্রথমে এমন একটা খাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। যদিও মিকি সেটা নিজের মতো করে এখন বদলে নিয়েছে। তবু আমাকেই বলছে আমি আসব কিনা? মেয়েটার হয়েছেটা কী?

"তুমি চাও না, আমি আসি?" অভিমান হয়েছিল খুব।

"দেখো, আমরা সব বন্ধুরা একসঙ্গে থাকব। সেখানে তোমার আনকমফর্টেবল লাগবে না তো? মানে ওরা তো তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তাই বলছিলাম।"

আমার মাথা ঘুরছিল! এ কী বলছে মেয়েটা?

মিকি আবার বলেছিল, "ঠিক আছে, তুমি এসো। বাট প্লিজ, কাউকে বোলো না যে, তুমি আমার বয়ফ্রেন্ড।"

"কেন?" আমি ততক্ষণে পাম্প-ছাড়া ফুটবলের মতো ঢ্যাপ ঢ্যাপ করছিলাম।

"কেউ জানে না তো। আর জানলে সবাই আমায় খ্যাপাবে। বলবে..." মিকি কথা শেষ না করে ঠোঁট কামড়ে সামলে নিয়েছিল।

"কী বলবে মিকি?" কোনওমতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুমি কি আমায় আর ভালবাসো না? আর উই গুড? ইজ এভরিথিং ওকে?"

যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে মিকি একটা বড় দোকান দেখিয়ে বলেছিল, "এতে চলো। এখান থেকেই জিন্‌স কিনব।"

ঘোলাটে চোখে দেখেছিলাম, সমস্ত মলটাই লাট্টুর মতো পাক খাচ্ছে।

বিছানায় শুয়ে থাকা পটাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, "ওঠ না শালা, আমার খাট বেশিক্ষণ তোর ভার সহ্য করতে পারবে না! এ কি তোর বউ পেয়েছিস?"

পটাই তবু উঠল না। বরং আর একবার ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বলল, "বিয়ে তো করলি না, তুই আর কী বুঝবি? শালা বউয়ের মতো জিনিস আর হয় না। বাঁশ বল বাঁশ, কঞ্চি বল কঞ্চি! পুরো হেল করে দেবে লাইফ।"

"কেন? পিপি কী বলেছে?" জিজ্ঞেস করে মোবাইলের ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে ন'টা নাগাদ যাব বলেছি। এখনই প্রায় আটটা কুড়ি বাজে।

"পিপি কোথায়? সে তো এখন পিপে হয়ে গিয়েছে মোটা হয়ে! আমায় বলেছে, আমি যদি বাড়ি ঢুকি, তা হলে আমার নাকি ঠ্যাং খোঁড়া করে মোড়ের মাথায় পাঠাবে ভিক্ষে করতে! আর নাকি আমার পত্রিকার দপ্তরে গিয়ে জনে জনে বলে আসবে, আমি একজন রেপিস্ট!"

"কী? টাইপিস্ট?" দেরি হচ্ছে বলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম সামান্য সময়ের জন্য।

"শালা! প্রোফেসর ক্যালকুলাস হয়ে গেলি নাকি? বলছি বনলতা সেন, শুনছে হারিকেন! আমায় রেপিস্ট বলেছে, রেপিস্ট! বুঝেছিস?" পটাই তর্কের গন্ধ পেয়ে আবার উঠে বসল।

এখন তর্ক মানে আজ রাতে পার্টি তো গেলই, কাল সকালেও অফিস যেতে পারব কিনা কেউ বলতে পারবে না! তাই বললাম, "ওঃ, সরি!"

"সরি মানে? এটা কি বাস নাকি যে, পায়ে পা চাপা দিয়ে বলবি, সরি? জানিস, রেপিস্ট মানে কী?"

"তুই কি ম্যারাইটাল রেপ অ্যাটেম্পট করতে গিয়েছিলি নাকি?"

"পাগল? পিপিকে রেপ? আমাদের দু'জনের ভুঁড়ির সাইজ দেখেছিস? টেকনিক্যাল প্রবলেমের কথাটা ভাব। তা ছাড়া বউয়ের সঙ্গে সেক্স করা যায় নাকি? তার চেয়ে হস্তশিল্প ফার বেটার।"

"তবে?" এবার সত্যি অবাক হলাম।

"আরে সে নয়। আমাদের পত্রিকায় নানা ছেলেমেয়ে তো আসে লেখা দিতে, তাদের নাটকের রিভিউয়ের জন্য, এগজিবিশনের ইনভিটেশন নিয়ে। সেরকমই একটা মেয়ে এসেছিল। ও কবিতা লেখে। ওর সঙ্গে আমি দু'দিন একটু কফি খেতে গিয়েছিলাম। তা ব্যস, পিপি জেনে ফেলেছে। আর যায় কোথায়? বাড়িতে কুরুক্ষেত্র!"

"তা কেমন দেখতে মেয়েটাকে?" আমি কৌতূহলী হলাম।

"দেখতে?" পটাই ঢোঁক গিলল। ঠোঁট চাটল। তারপর চশমাটা খুলে নাকটা চুলকে নিল একটু। বলল, "তা দেখতে মানে, ইয়ে বেশ... ইয়েই আর কী। তবে কবিতাটা লিখতে পারে না। কিন্তু ভাব একবার, একটা মেয়ে সুন্দরী হবে আবার কবিতাও লিখবে, সেটা খুব বেশি ডিম্যান্ড করা হয়ে যাচ্ছে না? সুন্দর দেখতে মেয়েদের লেখা এমনিতেই আমি ছাপার জন্য রেকমেন্ড করি।"

"শালা আলু," আলতো ঘুষি মারলাম পটাইকে, "দাঁড়া, পিপিকে বলছি। আর তোদের পত্রিকার এডিটর ইন চিফকে উড়ো ফোন করছি, তুই তো শালা হাতির মতো দেখতে শেয়াল! এখন ওঠ। আমায় মিকির বার্থ ডে-তে যেতেই হবে। আর দেরি করলে হবে না।"

"মিকি আর মিকি! ওয়াল্ট ডিজনি না রয়্যালটি চেয়ে বসে, দেখিস! এখন আমি কোথায় যাই বল তো?" পটাই উঠে দাঁড়াল।

আমি উঠে টেবিল থেকে গিফ্‌টের প্যাকেটটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বললাম, "আয়, দরজা বন্ধ করব এবার। আর পিপির কাছে ফিরে যা। একটু বকুনি খাবি, তারপর পিপি যা মেয়ে, ঠিক শান্ত হয়ে যাবে।"

"তোকে কি গাড়িতে লিফ্‌ট দেব?" পটাই ঘরের বাইরে এসে আড়মোড়া ভাঙল।

"না, আমার বাইক আছে। ভুলে গেলি?"

"ও, তাই তো! ঠিক আছে, আমি সুশান্তর বাড়ি যাচ্ছি। একটু মাল খেতে হবে। না হলে নার্ভ স্ট্রং হবে না। পিপিকে ফেস করতে পারব না।"

"তুই পিপিকে এত ভয় পাস কেন রে?" দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা পকেটে ভরে বললাম।

"তুই মিকিকে পাস না? একরত্তি একটা মেয়ে, তার ভয়ে তো প্যান্টে হিসি করে ফেলিস! শালা ভাটের জ্ঞান দিবি না।"

চুপ করে গেলাম। সত্যি আমি মিকিকে ভয় পাই! বিশেষ করে এখন যেন ভয়টা আরও বেড়েছে! কেবলই মনে হয়, মিকি কি আমায় ছেড়ে দেবে? আমায় আর আগের মতো পাত্তা দিচ্ছে না কেন? আমাদের বয়সটা কি তবে সত্যি কোনও ফ্যাক্টর হয়ে গেল?

"এ কী, তুমি বেরোচ্ছ?" কাকিমার গলায় আমার চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ল।

"হ্যাঁ, আপনাকে যে সকালে বললাম, রাতে খাব না!" আমি তাড়াতাড়ি বললাম।

"ও তাই তো!" কাকিমা হাসল, "আসলে বয়স হচ্ছে তো, তাই ভুলে গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস, পদ্মাকে ভাত বসাতে বলিনি এখনও। আসলে তোমরা তো ছোট, তাই বুঝবে না বয়স হলে কেমন ভুলো মন হয়ে যায় মানুষের।"

আমি ছোট? মনে হল, কাকিমাকে বাইকের পিছনে তুলে একবার মিকির সামনে নিয়ে যাই! তারপর মিকিকে বারবার শোনাই যে, আমি আসলে ততটা বড় বা বুড়ো এখনও হয়ে যাইনি! কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। তাই ব্যাজারমুখে বললাম, "না, তেমন আর কী বয়স হয়েছে আপনার!"

"ভালই বাটার লাগাতে পারো তো?" অণুর গলাটা পিছন থেকে পেলাম।

"অ্যাঁ? বাটার?"

"জেঠিমার বয়স কম?"

"তবে কি আমি বুড়ি?" কাকিমা এবার আমার দিক থেকে ঘুরে চোখ পাকাল অণুকে।

অণু হাসল, "ইউ হ্যাভ এজড গ্রেসফুলি। আর সুন্দর মানেই যে ইয়ং থাকতে হবে, তেমন কিছু নেই। যারা শ্যালো, তারাই এমন ভাবে। আর ইয়ং মেয়েদের সঙ্গে নানা সিনেমা, রেস্তরাঁ আর শপিং মলের সামনে ঘুরে বেড়ায়।"

মানে? শুকনো বিষম খেলাম এবার! বলে কী মেয়েটা? শপিং মল! আমি যে সেদিন শপিং মলের সামনে ছিলাম, সেটা তো জানত। কিন্তু আমার সঙ্গে যে একটা ইয়ং মেয়ে ছিল, সেটা কি ও দেখেছে? কিন্তু ও তো সেই নিলয় বলে ছেলেটার সঙ্গে চলে গিয়েছিল। তবে দেখল কেমন করে?

"তুইও কম বাটার দিতে পারিস না!" কাকিমা হাসল। তারপর বলল, "তোর মা ফোন করেছিল। বলছিল, তুই নাকি ওখানে যেতে চাইছিস না? বহুদিন বাড়ি যাসনি। মা-বাবার চিন্তা হচ্ছে খুব তোর জন্য। আমায় বলল, তোকে যেন ঠেলে বাড়ি পাঠাই।"

"সত্যি!" অণু ঠোঁট উলটাল, "মায়ের যে কী মনে হয়, কে জানে! আমি কি এখানে ইয়ারকি মারছি, বলো? ইউনির্ভাসিটিতে ক্লাস নিতে নিতে অবস্থা টাইট হচ্ছে! আর আমি কি আর সেই বাচ্চা মেয়েটা আছি? মাকে কতবার বলেছি যে, আমার জন্য যেন চিন্তা না করে। এমনিতেই বাবা মায়ের দু'জনেরই হাই প্রেশার। এরা আমায় পাগল করে দেবে!"

পটাই হঠাৎ করে বলে উঠল, "সুন্দরী মেয়ে বাইরে থাকলে বাবা-মায়ের তো চিন্তা হবেই।"

"ও তাই বুঝি? আর যারা ততটা ফিজিক্যালি সুন্দর নয়, তাদের জন্য বাবা-মায়েদের চিন্তা হয় না?"

আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করলাম। এই রে অণু ভুল জায়গায় খেলে ফেলেছে। এ যেন কাঙালের সামনে শাকের খেতের দরজা খুলে দিয়েছে। এ তো এবার ফাটিয়ে তর্ক শুরু করবে পটাই। কিন্তু তার আগেই আমাকে কিছু একটা করতে হবে। কারণ, না হলে, এবছর তো ভুলে যাও সামনের দুটো বছরের বার্থ ডে-তেও আমি পৌঁছোতে পারব না। তাই আমি মাঝখানে ঢুকে পড়ে বললাম, "বাদ দে না পটাই। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল।"

"তুমি কোনদিকে যাচ্ছ?" অণু জিজ্ঞেস করল আমায়।

"আমি?" একটু অবাক হলাম, "কেন বলো তো?"

"প্রশ্নের উত্তর কি আর একটা প্রশ্ন হয়?" ব্যাজার মুখে আমার দিকে তাকাল অণু।

আমি একটু থমকে গেলাম। বারান্দার আলোটা কি ঝিলমিল করে উঠল একটু? নরম, নীলাভ একটা আলো কি অন্যরকম হয়ে উঠল একটু সময়ের জন্য? না হলে... না হলে অণুর ওই বড় বাদামি চোখগুলো অমন মনে হল কেন আমার? কেন মনে হল, আমার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে একটা অচেনা ঘোড়া পা ঠুকল? আমার কী হল হঠাৎ? এ তো ভাল কথা নয়!

"কী হল? আমার কথা কানে ঢুকছে না?" অণুর গলায় সামান্য ধৈর্যের অভাব লক্ষ্য করলাম।

"পার্ক স্ট্রিট যাব। একটা রেস্তরাঁয়।"

"আমায় ক্যামাক স্ট্রিটে ড্রপ করে দেবে?"

"আমি?" অবাক হলাম, "কিন্তু আমার তো বাইক। তোমার প্রবলেম হবে।"

"শিলিগুড়িতে আমারও একটা স্কুটি ছিল। আমি রাইড করতে জানি। তুমি নেবে না বলো!" অণুর বিরক্তিটা এবার রাগে পরিণত হল।

"আরে, আরে, তাই বললাম নাকি?" আমি আতান্তরে পড়লাম, "অবশ্যই ড্রপ করে দেব।"

"তা এখন কোথায় যাবি শুনি?" কাকিমা অণুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "শীতকালের রাত। এখন গেলে ফিরবি ক'টায়?"

"নিলয়দের বাড়িতে যাব। ওর বাবা বলছিলেন, বিদেশে একটা কাজের সুযোগ আছে। সেটা নিয়ে কথা বলতে চান। কাল সকালে ভদ্রলোক আবার দিল্লি চলে যাচ্ছেন। যাওয়ার আগে নিলয়ের কথায় আমার সঙ্গে একবার দেখা করবেন বলেছেন।"

"ও" কাকিমা মুখ চিপে হাসলেন, "নিলয়ের নাম আগে শুনিনি তো!"

"নতুন জয়েন করেছে যে!" অণু কাঁধের ব্যাগটা ঠিক করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "চলো। অন্তত একপিঠের ট্যাক্সি ভাড়াটা তো বাঁচবে।"

পটাই গাড়িতে ওঠার আগে আমায় চাপা গলায় বলল, "সাবধানে যাস। অণু-পরমাণু নিয়ে যে-কোনও কেসই কিন্তু গন্ডগোলের!"

এদের আমি কী বলব? আমার একজন প্রেমিকা আছে। তাকে বিয়ে করব বলে আমি রেডি। সারা বাড়ির সঙ্গে তার জন্য আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে আছি। আর সেখানে আমায় এসব অণু-পরমাণু দেখাচ্ছে!

রাস্তায় ভিড় এখন একটু পাতলার দিকে। প্রায় পৌনে ন'টা বাজে। ফালতু-ফালতু সময় নষ্ট করলাম কাকিমার সঙ্গে কথা বলে। কোনও দরকারই ছিল না। আসলে কেউ কথা বললে তো আর গটগট করে তার সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় না।

বিজন সেতুর উপরে যখন আমার বাইক, তখন হঠাৎ অণু বলল, "এত আস্তে চালাও কেন তুমি? এর চেয়ে হেঁটে গেলে তো তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতাম বলে মনে হচ্ছে!"

আমার বিরক্ত লাগল। মেয়েটা কি কখনওই সোজা কথা বলতে পারে না? গম্ভীরভাবে বললাম, "আমার মরার তাড়া নেই!"

"আমি চালাব? মরার তাড়া না থাকলেও আমার পৌঁছোনোর তাড়া আছে।"

"সে আমারও আছে," আমি সামনের গাড়ির ফাঁক ফোকর দিয়ে স্পিড বাড়ালাম।

অণু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তুমি জানো, আমি শিলিগুড়ির মেয়ে?"

"তাই? আজ জানলাম!" ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্স দিয়ে বেরিয়ে গড়িয়াহাট ব্রিজের তলা দিয়ে পার্ক সার্কাসের দিকে বাইক ছোটালাম।

"আমি এখানে ইউনির্ভাসিটিতে পড়াই," অণু নিজের মনেই বলল।

"বাঃ!" আর কী বলব বুঝতে পারলাম না।

"আমি বাবা-মায়ের এক মেয়ে। আর কেউ নেই। বাবা-মা শিলিগুড়িতে থাকে। বাবা ব্যাঙ্কে চাকরি করে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। কতদিন বাবা মাকে দেখিনি!" অণু কাকে বলছে এসব?

অভদ্রতা হবে ভেবে বললাম, "তাই? ও! তা ঘুরে এসো না বাড়ি থেকে।"

"আচ্ছা?" অণু হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ডোন্ট মাইন্ড, কিন্তু তোমার সঙ্গে সেদিন ওই বাচ্চা মেয়েটা কে ছিল? তোমার বোন?"

"মানে?" চমকে, রেগে প্রায় ব্যালেন্সই হারিয়ে ফেলছিলাম বাইকের!

"ওই যে মলের সামনে, সন্ধেবেলা। কে হয় ও?"

আমতা আমতা করে বললাম, "ও... ও আমার বন্ধু!"

"ওইটুকু একটা মেয়ে? বন্ধু?" অণুর গলায় যেন অবিশ্বাস।

আর কোনও কথা বললাম না। কেন বলব? ও কে যে, আমার হাঁড়ির খবর ওকে দিতে হবে? আর এমন বাজে কৌতূহল ভালও লাগে না আমার। এক বাড়িতে আছি, আছি। অত ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ করার কী আছে? তা ছাড়া আমার কৌতূহল নেই কোনও।

ক্যামাক স্ট্রিটে একটা বড় ফার্নিচারের দোকানের পাশে বাইকটা থামালাম। অণু নামল। আর নামার সময় হঠাৎ অদ্ভুত বুনোফুলের নরম মিষ্টি গন্ধ পেলাম! অণুর চুলটা আলতো করে আমার গাল ছুঁয়ে গন্ধটা রেখে গেল যেন। ক্যামাক স্ট্রিট একটু টাল খেয়ে গেল কি?

শালা, কনসেনট্রেট, কনসেনট্রেট! মনে মনে চিৎকার করে উঠলাম। সামনে মিকি বসে আছে। সেখানে আরও অনেকে আছে। এমনিতেই দেরি হয়েছে। মিকি হয়তো রাগ করেই ফোন করছে না। আর আমি এখানে বুনোফুলের গন্ধ শুঁকে টাল খাচ্ছি? কী হচ্ছে এসব?

অণু থ্যাঙ্কস জানিয়ে যেতে গিয়েও থমকাল, "সাবধানে ফিরবে। নেমন্তন্ন যখন, তখন নিশ্চয়ই ড্রিঙ্ক করবে? সাবধানে চালাবে।"

"আমি কোনও নেশা করি না অণু," ছোট্ট করে বললাম।

অণু স্পষ্ট করে তাকাল আমার দিকে, "তাই?" তারপর হঠাৎ বলল, "তুমি আমার পুরো নাম জানো?"

"পুরো নাম?" আমি অন্ধকারে হাতড়ালাম। সত্যি তো! অণু তো ভগ্নাংশ, পুরোটা কী হবে? আমি তো জানিই না ওর পুরো নাম!

"জানো না তো? কিন্তু আমি জানি তোমার নাম।"

"কী নাম তোমার?"

অণুর হাসি হাসি মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। ও বলল, "বলব না, যাও।"

রেস্তরাঁর দরজাটা খুলেই মনে হল, কেউ যেন লাল আলোয় চুবিয়ে দিয়েছে পৃথিবীটা। বাইরের নানা রঙের পৃথিবীর থেকে এমন একটা রেড অ্যান্ড ব্ল্যাকের দুনিয়ায় এসে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল! গোল গোল টেবিল আর তা ঘিরে রাখা চেয়ার। তার উপর ঝুঁকে আসা আলো। আমার কেন যেন রেস্তরাঁয় বসে থাকা মানুষগুলোকে এক রকম মনে হয়! তাই প্রথমে ঠিক বুঝলাম না, কোথায় বসে আছে মিকি। তিরিশ সেকেন্ড খোঁজার পর ওদের দেখলাম। আর যা দেখলাম, তাতে আমার সারা শরীরে কেউ যেন গরম তেল ঢেলে দিল! দেখলাম, মিকির সঙ্গে আরও চারটে ছেলেমেয়ে বসে রয়েছে। আর তাদের মধ্যে একটা ছেলে মিকিকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে ওর কানের ভিতর প্রায় ঢুকে ওকে কী যেন বলছে! আর মিকির মুখে হাসি, চোখ আধবোজা। হাতে গ্লাস! মিকির যে পছন্দ হচ্ছে ব্যাপারটা, সেটা স্পষ্ট!

বুঝলাম, মিকি এতক্ষণ যে ফোন করেনি, তার কারণ রাগ নয়। আসলে মিকি ভুলেই গিয়েছে এই লাল রঙের রেস্তরাঁর বাইরে লাল বলেও কেউ আছে এই কলকাতায়!

পাঁচ

কলকাতা শহর বড় হয়ে গিয়েছে, নাকি আমার পা দুটো ধীরে চলে আজকাল? মনে হল, এই লম্বা, হলুদ আলোর রাস্তাগুলো আসলে কোথাও নিয়ে যায় না মানুষকে। কোথাও নিয়েও আসে না। স্বার্থপরের মতো এরা শুধু নিজের খেয়ালে শুয়ে থাকে।

আসলে কারও যখন মনখারাপ থাকে, তখন সবকিছুই তার বাজে লাগে। এই যে অফিসের গাড়ি আজ অনেকটা পৌঁছে দিল আমায়, সেটাতেও বসে থাকতে অসহ্য লাগছিল! কেবলই পকেটের মোবাইল ফোনটার দিকে চোখ চলে যাচ্ছিল। আর দেখছিলাম ঠান্ডা, নিথর একটা

যন্ত্র প্যাট প্যাট করে চেয়ে আছে আমার দিকে! চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি হয়ে গেল এটায় কল করেনি মিকি! মেসেজও পাঠায়নি একটাও। আমি জানি, আর পাঠাবেও না।

গাড়িটা আমায় বাড়ি অবধি পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। আমিই না করেছি। ভাল লাগছে না কিছু। শুধু হাঁটতে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে, হাঁটতে হাঁটতে এই পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য কোথাও চলে যাই! আসলে ভাঙা কাচের চেয়েও ভাঙা প্রেম অনেক বেশি বিপজ্জনক। একবার মনের ভিতরে ঢুকে গেলে খুব ভোগায়।

আনন্দ আমাদের যেমন কিছুটা বেহিসেবি বানিয়ে দেয়, তেমনই দুঃখ আমাদের দার্শনিক বানায়! আর প্রেমের দুঃখ মানুষকে শুধু দার্শনিক নয়, ঘ্যানঘ্যানে দার্শনিক বানিয়ে ছাড়ে একেবারে! মনে হয়, যেন কেউ অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়ে দিয়েছে! মুখে রুচি নেই, শরীরে জোর নেই। ইস, আফশোস হচ্ছে আমার। কেন যে মরতে উনত্রিশ বছর বয়েসে প্রেমে পড়লাম! তাও নিজের চেয়ে একটা দশ বছরের ছোট মেয়ের! আগেই বোঝা উচিত ছিল যে, এদের মন ফড়িঙের মতো। এক জায়গায় থিতু হতে চায় না। প্রেম যে ধ্রুপদী সংগীত, এরা তা মানে না। এরা স্টেজে উঠে গানের তালে চুল ঝাঁকানোতেই বেশি আগ্রহী। ফলে এদের কাছে প্রেম আর টিসুর মধ্যে পার্থক্য নেই একদম। যে ঝাড়ের বাঁশকে ঝাড়েই রাখতে চেয়েছিলাম, সেটাকে কেন আমি কেটে একদম নিজের কাছে নিয়ে এসেছি, কে জানে!

আমার 'পেরেম'টা কাঁচি হয়ে গিয়েছে! আজকেই এই শব্দটা শুনেছিলাম দোকান থেকে চিকলেট কেনার সময়। পানওয়ালা ছেলেটাকে দুঃখ দুঃখ মুখ করে অল্পবয়সি একটা ছেলে বলছিল। আর পানওয়ালাটা বলছিল, "বেঁচে গিয়েছিস শালা, এবার ইচ্ছে মতো চরে খা!"

চরবে কোথায়? পাহাড়ে? প্রেম কেটে গেলে তো সন্ন্যাসী হয়ে পাহাড়ে চড়তেই ইচ্ছে করে! কে জানে, হয়তো সমস্ত পর্বতারোহীই আসলে 'পেরেম' কাঁচি হওয়া মানুষ!

কিন্তু আমারটা যে এমন হতে যাচ্ছে, সেটা আমার ফাঁকিবাজ পাঁচটা সেন্স ধরতে না পারলেও ছ'নম্বরটা ঠিক ধরেছিল! কিন্তু সেটার কথা ঠিক মানতে পারছিলাম না। তবে এটা দেখছিলাম যে, মিকি আমায় এড়িয়ে যাচ্ছিল। যে-মেয়ে প্রায় সারা রাত মেসেজ করে পাগল করে দিত, সে মেসেজ করাই বন্ধ করে দিয়েছিল! ভাল করে সারাদিন কথাই বলছিল না শেষের ক'দিন! ফোন করলে দু'-এক মিনিট কথা বলে কাটিয়ে দিচ্ছিল। এমনকী, দেখা পর্যন্ত করতে চাইছিল না শেষের দুটো দিন। মন প্রমাদ গুনছিল তখনই।

তবে আমিও ছাড়িনি। গতকাল একদম ওদের ক্লাস শেষের সময় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম কলেজ গেটে। মিকি তো আমায় দেখে একদম ভূত দেখার মতো করে চমকে উঠেছিল।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ব্যাপার কী তোমার? ফোন ধরছ না? কথা বলছ না? হলটা কী?"

"তুমি এখানে এসেছ কেন?" মিকির গলায় ঝাঁঝ দেখে অবাক হয়েছিলাম।

"মানে? আসব না?"

মিকি এদিক-ওদিক দেখে আমায় হাত ধরে টেনে রাস্তার উলটোদিকে একটা বড় গাছের তলায় নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল, "তুমি এখানে কী করতে এসেছ? সিন ক্রিয়েট? সেই বার্থডে-র সন্ধেবেলা থেকে দেখছি তুমি কেমন যেন করছ!"

"আমি কেমন করছি? কে অ্যাভয়েড করছে আমায়? কে পালিয়ে পালিয়ে থাকছে? তুমি কী চাও বলো তো?"

"কী আবার? কিছুই না!" মিকি এমন করে বলেছিল যেন টোকা দিয়ে প্যান্ট থেকে বিস্কিটের গুঁড়ো ঝাড়ছে, "তুমি বড্ড ঘ্যানঘ্যান করো। সবসময় দুঃখী মুখ করে ঘুরে বেড়াও। একদম দুখী আত্মা টাইপ। ভীষণ বোরিং।"

"কী?" কোনও কথা বলতে পারছিলাম না, "মিকি, এসব কী

বলছ তুমি? তোমায় বিয়ে করব আমি। ভুলে গিয়েছ? আমাদের বিয়ে হবে।"

"পাগল নাকি? আমার কী এমন বয়স যে, এখনই বিয়ে করব? তোমার বয়স হয়ে গিয়েছে, তাই এমন ডেসপো হয়ে গিয়েছ। লেট মি এনজয় মাই লাইফ।"

"মানে?" আমার হাত-পা ঘামছিল এই ডিসেম্বরেও। কী বলছে মেয়েটা? ওর কোনও ভুল হচ্ছে না তো? ও আমায় চিনতে পারছে তো? রাতারাতি দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে আমায় অন্য কারও মতো দেখতে হয়ে যায়নি তো? আমি পাশে স্ট্যান্ড করা একটা মোটরবাইকের আয়নায় মুখটা দেখে নিয়েছিলাম।

"মানে মানে করো কেন সবসময়? আমায় কি ডিকশনারির মতো দেখতে?"

মিকিকে আর চিনতে পারছিলাম না আমি। এ যে ডিকশনারি নয়, সেটা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু কোন ধরনের নারী, সেটা বুঝতে পারছিলাম না। নিরুপায় হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, "আমায় তুমি ভালবাসো না মিকি?"

"আচ্ছা মুশকিল!" মিকি ধমক দিয়েছিল, "সবসময় ভালবাসা, প্রেম, এসব করে মাথাখারাপ করো কেন তুমি? শোনো, আমি খুব স্বার্থপর। আমার পক্ষে কাউকে ভালবাসা সম্ভব নয়। ইউ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। অ্যান্ড নো হার্ড ফিলিংস।"

আমার শরীরের ভিতর লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝিপোকা ঢুকে পড়েছিল। সন্ধের কলকাতায় স্পষ্ট কিছু দেখতে পারছিলাম না যেন। যেন চিনতে পারছিলাম না কিছু।

"আমায় প্লিজ আর বদার কোরো না। তোমার বয়সি কাউকে খুঁজে নাও। বাই।"

কাউকে মানে? 'কাউ' মানে তো গোরু। এতদিন কি আমায় গোরু বানাল মিকি? এত ভালবাসার কথা, এত আবদার আর বায়না। এত হাত

ধরা, ঠোঁট কামড়ে চুমু তবে কেন? সব কি জাস্ট টাইম পাস? জাস্ট মজা? ইন্টিগ্রিটি বলে কিছু নেই? এদের কাছে কি সব চলে? 'নো হার্ড ফিলিংস' মানে কি আসলে 'নো ফিলিংস'? যখন-তখন কি এভাবে কাউকে বাতিল জুতোর মতো ফেলে দেওয়া যায়? এরা কোন জেনারেশনের প্রতিনিধি? এদের কি নিজেদের স্বার্থপর বলতে একটুও খারাপ লাগে না? এরা কি বোঝে না যে, স্বার্থপরতা আসলে একটা খারাপ মানসিক দিক? একটা অসুস্থতা? অসুস্থতাই কি তবে এই সময়ের ট্যাগলাইন?

রাতের ফেলে যাওয়া কালো ফিতের মতো পড়ে আছে রাস্তা। আর তার ধারে-ধারে ললিপপের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে উজ্জ্বল ল্যাম্পপোস্ট। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না আমার। কাকু-কাকিমা গোড়াতেই বলে দিয়েছিলেন যে, যেদিন ফিরতে দেরি হবে, সেদিন যেন খবর দিয়ে দিই ফোন করে। মেন গেটের একটা চাবি দেওয়াই থাকে। আর খাবারও ক্যাসারোলে ভরা থাকবে। কিন্তু মন-মেজাজ এমন খারাপ হয়ে আছে যে, আমার খবরটা দিতে ইচ্ছে করেনি। ফোনটাও সারাদিনই প্রায় বন্ধ করে রেখেছিলাম। গাড়িতে আসতে আসতে খুলেছি। ফলে জানি না, কাকিমারা ফোন করেছিল কিনা!

পাড়াটা আজ বড্ড নিঃঝুম লাগছে। প্রায় রাত সাড়ে বারোটা বাজে। ফলতার টেন্ডারটা নিয়ে অফিসে শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই হচ্ছে। প্রোপ্রাইটারস্যার নিজে টেকনিক্যাল ম্যান না হয়েও আমাদের সঙ্গে সারাটা সময় বসে ছিলেন। বলেছিলেন, ডিনার করে যেতে। আমার ইচ্ছেই করেনি। বিরিয়ানি আনা হয়েছিল। গন্ধেই আমার গা গুলিয়ে উঠেছিল একদম। জার্মান ভদ্রলোক গেহার্ড পর্যন্ত আজ হাত দিয়ে আহা আহা করে বিরিয়ানি সাবড়েছে। আর সেখানে আমি শুধু থেকে-থেকে ক্যালকুলেশনে ভুল করে গিয়েছি আর দশ পাতা লম্বা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। গুপ্তসাহেব তো একসময় বলেই ফেলেছিলেন, "কী হল লাল? তোমার হাঁপানি হয়েছে নাকি?"

আসলে ফলতার এই প্রোজেক্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কোম্পানির পক্ষে। রাইভাল কোম্পানি মেহতা বিল্ডার্সদের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি ফাইট হবে। পোদ্দারস্যারের কাছে কাজটা পাওয়ার চেয়েও, এই কাজের ক্ষেত্রে প্রেস্টিজটা বড়। উনি বলেছেন যে, নো লস নো প্রফিট অবস্থাতে হলেও কাজটা উনি করতে চান। মেহতাকে উনি এই কাজটা নিতে দেবেন না। তাই উনি নিজে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন। আর আমি সেখানে, মালিকের সামনে ক্যালকুলেশনে ভুল করে, টেন্ডারের ক্লজ পড়তে ভুল করে, কোটেশনের বানান ভুল করে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একসা করেছি!

বেরোনোর সময় গুপ্তসাহেব আমায় কোণে ডেকে নিয়ে বলেছেন, "কী হে, প্রেমে পড়েছ, না প্রেম থেকে উঠেছ? এমন করলে কিন্তু আমিও তোমার চাকরি বাঁচাতে পারব না। পোদ্দারস্যার টেকনিক্যাল লোক না হতে পারেন। কিন্তু একশো কোটি টাকার ব্যাবসা তো করেন? ওঁকে বোকা ভেবো না। আর এটাও ভেবো না যে, উনি কিছু লক্ষ করছেন না। কাল থেকে যা প্রবলেম হবে, সেক্টর ফাইভের বাইরে রেখে আসবে।"

প্রবলেম কি ছেলের হাতের মোয়া নাকি যে, বাড়ির মিটসেফে রেখে আসব? আমি বলে বাইক পর্যন্ত চালাতে পারছি না! কষ্টে মাথাখারাপ হয়ে যাচ্ছে আর উনি আমায় পোদ্দার দেখাচ্ছেন! তেমন হলে দেব শালা ছেড়ে। আমার প্রেমের চেয়ে টেন্ডার বড় হল? শুধু মিকি নয়, সব শালা স্বার্থপর! সব শালাকে দেখে নেব! পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে চিৎকার করে কথাগুলো বললাম। সত্যি চিৎকার করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এপাড়ার কুকুরগুলো খুব রাগী প্রকৃতির। একদম হই-হট্টগোল পছন্দ করে না। আর এখন ব্যর্থ প্রেমের কামড়ের সঙ্গে কুকুরের কামড়টা আর নিতে পারব না!

হঠাৎ পকেটের ফোনটা পিকপিক করে নড়েচড়ে উঠে জানান দিল যে, সে মরে নাই! এসময় কে ফোন করল হঠাৎ? বিরক্তমুখে পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখলাম। আরে, দাদা! এখন?

"বল," গলা দিয়ে কোনওমতে যেন স্বর বেরোল।

"লাল," দাদার গলা কাঁপছে।

কী হল আবার? আমার বিরক্ত লাগল। এখন নিজেরই ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা, সেখানে দাদা আবার হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল কেন কে জানে? এখন ইচ্ছে না হলেও স্ট্রং ক্যারেক্টরের রোল প্লে করতে হবে। কিছু মানুষ আছে, যারা সমস্যায় পড়লেই অন্যের কাঁধ খোঁজে। তারা ভুলে যায়, যার কাঁধে মাথা রাখতে ইচ্ছে করছে, তারও কোনও সমস্যা থাকতে পারে! আমার দাদা এই প্রজাতির মানুষ। এমনিতে খুব ভাল লোক। কিন্তু সমস্যায় পড়লেই চার বছরের বাচ্চা হয়ে যায়! তখন দাদার একজন ন্যানি লাগে!

শীতের এই গভীর রাতে দাদার গলা শুনে বুঝলাম, আমি হলাম সেই ন্যানি!

"কী হয়েছে তোর?" গলার বিরক্ত লুকোলাম না।

দাদা পাত্তাই দিল না, "বিশাল কেস খেয়ে গিয়েছি রে!"

"কেস? কেন?" বুঝতে পারলাম না কথাটা কোনদিকে যাচ্ছে!

"শ্রী," দাদা একটা ছোট্ট পজ নিল। তারপর কাঁপা গলায় বলল, "শ্রী আজ সন্ধেবেলা আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছে!"

বেহালায় শ্রী-র বাপের বাড়ি, তা আমি জানি। সেখানে তো মাঝে মাঝে শ্রী যায়। এতে ভেঙে পড়ার কী আছে? বললাম, "তো কী হয়েছে? গিয়েছে তো কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? ও তো মাঝে মাঝেই যায়।"

"আঃ," দাদা বিরক্ত হল, "আরে বাবা, বুঝতে পারছিস না কেন? আমায় ছেড়ে চলে গিয়েছে। রাগ করে। বলেছে, আর কোনওদিন ফিরবে না। বরং শিগগির ডিভোর্স ফাইল করবে!"

"মানে?" জানি দাদাও ডিকশনারি নয়, তবু মুদ্রাদোষ যাবে কোথায়! সেটা ঢাকতে বললাম, "কেন ছেড়ে গেল তোকে? আর এত ফিসফিস করে কথা বলছিস কেন?"

"আরে, শীতের রাত। সারা বাড়ি নিঃঝুম। বাবা যদি জানতে পারে, রাস্তায় বের করে দেবে!"

"সে কী! বাবা জানে না?"

"পাগল হয়েছিস? বাবা জানলে আমায় আস্ত রাখবে? আমি বলেছি, ও এমনিই ঘুরতে গিয়েছে। বাবা তাতেই গাঁইগুঁই করছিল।"

তা ঠিক। বাবা, যতই ভালবাসুক না কেন, রাগ হলেই দাদাকে রাস্তায় বের করে দেয়! বিয়ের পরও দু'-দু'বার বের করে দিয়েছিল। আর শ্রীকে বাবা খুব ভালবাসে। হয়তো মেয়ে নেই বলে সেই জায়গাটাই দিয়েছে। আর এখন যদি শোনে, শ্রী বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে দাদার উপর রাগ করে, তবে দাদার কপালে অশেষ দুঃখ আছে!

"দাদা, ফালতু ভয় পাস না। তুই থাকিস দোতলায় আর বাবা একতলায়। ফালতু প্যানিক করা তোর স্বভাব হয়ে গিয়েছে। ভয়ে ভয়েই তুই গেলি। তা শ্রী চলে গিয়েছে কেন?"

"আর বলিস না!" বলে দাদা আবার থামল।

বিরক্তিটা এবার রাগে বদলে গেল। আরে বাবা, আমি কি বলতে গিয়েছি? তুই-ই তো মাঝরাতে ফোন করে মাথা খাচ্ছিস! আর আমিও ক্যালানের মতো সেসব শুনছি! তাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে। বললাম, "দ্যাখ দাদা, আমি এখন রাস্তায়। সারাদিন প্রচুর ঝাড় গিয়েছে। আর নিতে পারছি না মাইরি। তোর কথাটা কি কালকের জন্য থাকতে পারে না? আমার মাথায় এখন কিচ্ছু ঢুকছে না। সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর। ব্রেন কাজ করছে না একটুও।"

"কাল বলব?" দাদা চিন্তা করল, "কিন্তু এর মধ্যে যদি শ্রী বাবাকে ফোন করে বলে দেয়!"

"এতক্ষণে কি বলেছে?"

"না, তা বলেনি, তবে যদি বলে দেয়?"

"যদির কথা নদীতে! এখন রাখছি। কাল কথা হবে।"

"হ্যালো? লাল, হ্যালো?" বাবার কথা ভুলে দাদা চোরাবালিতে

পড়ে গিয়েছে এমন করে চিৎকার করল, "কাল সকালে তোর বাড়িতে যাব তা হলে। কেমন?"

"ঠিক আছে," বলে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা কেটে দিলাম।

এখানে আসার আগে আমি দাদাকে এবাড়ির অ্যাড্রেস আর ল্যান্ডলাইন নম্বর দিয়ে এসেছিলাম। ফলে দাদার খুব একটা সমস্যা হবে না আসতে। আমি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম।

ভরত রাত একটা নাগাদ শুতে যায় এবাড়ির আউটহাউসে। তার আগে অবধি ও গেটের কাছে থাকে। দেখলাম, গেটের এক কোণে দাঁড়িয়ে ও বিড়ি খাচ্ছে। আমায় দেখে বিড়িটা পিছনে লুকিয়ে একগাল হাসল, "কী লালসাব, এত দেরি হইয়ে গেল? অফিসে খুব কাম-উম পড়িয়েছে?"

কেঠো হাসিটা বের করলাম আবার। এরা বাংলা বলতে যায় কেন কে জানে? মনে হল, ভিতরে জমে থাকা রাগটা ভরতের উপর চালান করে দিই ওর বাংলার অজুহাতে! কিন্তু ছেলেটাকে দেখে মায়া হল। ভাবলাম, আজ গোটা দিনে ওই একমাত্র লোক যে, আমার সঙ্গে হেসে কথা বলল!

আমি বললাম, "তা একটু পড়েছে।"

ভরত হাসল, "এত কাম করবেন না সাব। তবিয়ত খারাব হই যাবে।"

হেসে এগিয়ে গেলাম বাড়ির দিকে। তারপর পকেট থেকে মেন গেটের চাবিটা বের করে দরজায় লাগাতে যাব, ঠিক তখনই আচমকা দরজাটা খুলল ভিতর থেকে। ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে এলাম একটু।

"এই তোমার ফেরার সময় হল?" দরজাটা খুলে অণু গম্ভীর গলায় বলল।

"তুমি? জেগে আছ?" আমি অবাক হলাম।

"কেন? জেগে থাকতে পারি না? কাকিমা তোমার উপর রেগে

গিয়েছে। একটা ফোন করতে কী হয়? আর না করবে ঠিক আছে। ফোনটা অন করেও কি রাখতে নেই?"

কেন কে জানে, আমার মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে গেল, বললাম, "তা আমার ফোন, আমি যা খুশি করব! লোকে কী ভাবল বা রাগ করল, তাতে আমার কী?"

"এমন করে বলছ কেন? তুমি রাতে দেরি করে ফিরবে, খাবে কিনা, এসব জিজ্ঞেস করতে হবে না? চিন্তা হয় না?"

"কেন চিন্তা হবে? আমি কি এবাড়ির কেউ? জাস্ট ভাড়াটে হিসেবে আছি," মনে হল, জীবনের সব ফ্রাস্ট্রেশন অণুর উপরই ঝেড়ে দিই!

অণু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ! তারপর আর কথা না বাড়িয়ে সংক্ষেপে বলল, "ডাইনিং টেবিলে খাবার আছে। খেয়ে নিয়ো। গুড নাইট।"

অণুর চলে যাওয়াটা দেখলাম। তারপর মেন গেট বন্ধ করে জুতোটা খুলে র‍্যাকে রাখলাম। ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে একবার খাবার টেবিলের দিকে তাকালাম। পেটে খিদেই নেই। বরং খাবার দেখে কেমন যেন গা-টা গুলিয়ে উঠল! জোর করে খেতে গেলে নির্ঘাত একটা বিপত্তি হবে! আসলে শরীর ভাল না থাকলে কিচ্ছু ভাল লাগে না। আর ডিপ্রেশন হলে আমি একদম খেতে পারি না!

সোজা নিজের ঘরের দিকে গিয়ে তালা খুলে ঢুকে পড়লাম। আজ ঘরটাও কেমন যেন বড় আর অদ্ভুত নির্জন মনে হল! কাঁধের ব্যাগটা চেয়ারে রেখে বিছানায় বসে পড়লাম। শরীরটা খারাপ লাগছে খুব। একা লাগছে। মনে হচ্ছে, বুকের ভিতর যে হাজার হাজার পাখি থাকত, তারা কোনও অজানা কারণে সবাই একসঙ্গে উড়ে চলে গিয়েছে বহু দূরে। শুধু একটা পাথুরে জমির উপর দিয়ে প্রায় শুকিয়ে আসা নদী বইছে। আমার নিজেকে হঠাৎ সেই নদীর ধারে পাথরে বসে থাকা একজন মানুষ মনে হল। মনে হল, আর কেউ কোনওদিন এই নদীর পাশে আসবে না। আমার কাছে আসবে না!

ঠকঠক করে দরজায় শব্দ হল একটা। কে আবার? নদীর ধার থেকে আবার ফিরে এলাম বোসপুকুরে, "কে?"

"আমি, অণু।"

উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলাম। এ আবার কেন?

"সরি টু বদার ইউ এগেন," অণুর গলাটা বরফ দেওয়া মাছের মতো শোনাল, "একটা ইনফরমেশন দেওয়ার ছিল।"

আমার এবার খারাপ লাগল একটু। মেয়েটা ভাল কথাই বলেছিল। ফালতু বেশি রিঅ্যাক্ট করে ফেলেছি। বললাম, "না, না। দ্যাটস অলরাইট।"

"তোমায় একটা মেয়ে ফোন করেছিল। কুসুমিকা।"

"মিকি?" হৃৎপিণ্ডটা একলাফে গলার কাছে চলে এল।

আমার প্রতিক্রিয়া দেখে অণু কেমন যেন থমকে গেল! বলল, "তুমি নাকি ওকে বাড়ির ল্যান্ডলাইন নম্বর দিয়েছিলে? কোনও এমার্জেন্সি হলে নাকি ফোন করতে বলেছিলে?"

মাথা নিচু করলাম। কথাটা ঠিক। আমিই নম্বরটা দিয়েছিলাম। আমার মোবাইল নম্বর তো মিকির কাছে আছেই। কিন্তু তাতে কোনও কারণে যদি যোগাযোগ না করতে পারে, তাই আমি অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা হিসেবে ওকে এবাড়ির ল্যান্ডলাইন নম্বরটা দিয়েছিলাম। আসলে আমি চাইতাম, আমাদের মধ্যের সেতুটা যেন না ভেঙে যায়! কিন্তু মানুষের হাতে যে সবটা থাকে না! কে জানে, হয়তো আজ আমার ফোনে ট্রাই করে পায়নি। বা এমনও হতে পারে যে, আমার সঙ্গে কথা বলবে না বলে ল্যান্ডলাইনে কল করে কিছু বলে দিয়েছে।

"কী হল, কথা কানে যাচ্ছে?" অণু একটু বিরক্ত হল।

"সরি, তো কী বলেছে?"

"তোমায় কয়েকটা জিনিস ফেরত দেবে মেয়েটা। জিনিসগুলো ও কলেজ স্ট্রিটের মোহনভাইয়ের কাছে রেখে এসেছে। তুমি যেন নিয়ে নাও।"

মোহনভাই! আমার খারাপলাগা যেন বেড়ে গেল কয়েকগুণ। আমায় নিজে এসে দিতে পারল না! অন্যের দোকানে রেখে গিয়েছে? আমি কি অস্পৃশ্য যে, আমার ছায়া মাড়াতে নেই? মোহনভাইয়ের ওখান থেকে বই কিনতে যেতাম আমরা দু'জনে। লোকটা আমাদের খুব ভাল করে চেনে। তা বলে তার দোকানে রেখে যাবে? এতটাই পর হয়ে গিয়েছি এই দু'দিনে?

বুকের ভিতরের নদীটা হঠাৎ দুলে উঠল যেন! হঠাৎ তাতে জলের তোড় বেড়ে গেল। আর নদীর দু'কূল উপচে সেই জল ধেয়ে গেল জনপদের দিকে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, অণু কেমন যেন আবছা হয়ে গেল! কেমন যেন ঢেকে গেল জলের পরদায়। আমার পায়ের জোর কমে গেল। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। হাঁটু মুড়ে মেঝের উপর বসে মুখ গুঁজে দিলাম দু'হাতে। আর গরমজলের স্রোত নেমে এল দুই গালে। আমার জগৎ-সংসার তুচ্ছ হয়ে গেল নিমেষের ভিতরে। আমার কুণ্ঠা কে যেন ইরেজার দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে দিল ক্রমশ! আমি নত হয়ে কাঁদতে লাগলাম। আর ঠিক তখনই বুনোফুলের নরম আর মিষ্টি একটা গন্ধ পেলাম আমি! আমার অবশ হয়ে আসা জ্ঞানের উপর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে গেল, জড়িয়ে গেল গন্ধটা। এ কীসের গন্ধ? এমন বুনোফুলের নাম কী? কোথায় জন্মায় এমন বুনোফুল? নদীর ধারে? কোন নদীর ধারে?

ছয়

গেহার্ড হরনারের হাতের পাঞ্জাটা এত জোরে আমার হাত ধরে ঝাঁকিয়েছিল যে, এই আধঘণ্টা পরও আমার হাত কনকন করছে। জার্মান ভদ্রলোক প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, ততোধিক মোটা। আমাদের কোম্পানি থেকে প্রথমে যে গাড়িটা দিয়েছিল, তাতে ঢুকতে-বেরোতেই

অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল ভদ্রলোকের। তারপর আমি একটা বড় এসইউভি নিয়েছি অফিস থেকে। আসলে আমাদের দেশের গাড়িগুলো আমাদের মতো লিলিপুটদের জন্য তৈরি। তাই গালিভারের দেশের মানুষজন এলে খুব সমস্যা হয়। ভদ্রলোক আজ মুম্বই চলে গেলেন। সেখানে ওঁর কী যেন একটা কাজ আছে। তবে এই ক'দিন আমাদের সঙ্গে ভদ্রলোকও খুব খেটেছেন। যাওয়ার সময় ওই দানবীয় হ্যান্ডশেকের সঙ্গে আমায় ভদ্রলোক একটা বড় চকোলেটের প্যাকেট দিয়ে গিয়েছেন। আমি চকোলেট খাই না। জানি না, এটা নিয়ে আমি কী করব!

অফিসের গাড়িটাকে সেক্টর ফাইভের অফিসে ছেড়ে দিয়ে আমার মোটরবাইক নিয়ে বেরিয়েছি। আজ ৩১ ডিসেম্বর। একটা ভেজা ভেজা ঠান্ডা, সেলোফেনের মতো জড়িয়ে রেখেছে কলকাতাকে। বছর শেষের একটা পাগল ভিড় ধীরে ধীরে বাড়ছে রাস্তায়। গোলপার্ক থেকে যাদবপুর পর্যন্ত রাস্তাটা বন্ধ ড্রেনের মতো হয়ে আছে। গাড়ি যে-গতিতে এগোচ্ছে, তাতে এইট-বি পৌঁছোতে পৌঁছোতে কলকাতা থেকে মানুষ চাঁদে পৌঁছে যাবে! এখন দেখি মানুষ কেমন যেন বন্ধ কৌটোর ভিতরে রাখা ছুঁচোবাজির মতো হয়ে গিয়েছে। সবসময় ছটফট করছে আর উৎসব নামক একটু ফাঁক পেলেই কৌটো থেকে বেরিয়ে এসে হামলে পড়ছে বাইরে! এটা কি চাপের জন্য হয়? মানুষের রোজকার প্রেশার আর ফ্রাস্ট্রেশন কি মানুষকে এমন করে দেয়?

বাইক চালাতে গেলে হাওয়া লাগে খুব। ঠান্ডায় হাত জমে যায়। তাই জ্যাকেট পরতে হয়। কিন্তু বাইক থামলেই পালটা গরম লাগে! মাথায় ক্র্যাশ হেলমেট আর জ্যাকেট পরে পাশের একটা গাড়ির বন্ধ কাচে নিজেকে দেখে কেমন যেন লাগল! ঠিক যেন মহাকাশে বেরিয়েছি আমি। এইট-বি-তে আমার আজ দুটো কাজ আছে। প্রথমে গুপ্তসাহেবের মায়ের কাছে যেতে হবে। ওঁকে একটা প্যাকেট পৌঁছে দিতে হবে। তারপর দেখা করতে হবে অণুর সঙ্গে!

প্লিজ, অন্য কিছু ভাবার কারণ নেই কোনও। আমার এখন সেকেন্ড

কোনও প্রেমে পড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। একটার ধাক্কাতেই আমি কচ্ছপের মতো উলটে গিয়েছি। আর নতুন কোনও সমস্যা ডেকে আনতে ইচ্ছুক নই। আসলে আজ অণুর একটা দরকারে আমায় ওকে সঙ্গ দিতে হবে। যদিও জানি না, দরকারটা কী! মানে, জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু অণু বলেনি। আমিও বেশি ঘাঁটাইনি। আজ শুক্রবার। কাল আমার অফিস ছুটি। ফলে আজ আমি সারাটা সন্ধে ফ্রি। বাড়িতে বসে ফালতু ফ্রাস্ট্রেশন খাওয়ার চেয়ে ঘোরাঘুরি করা অনেক ভাল। তাই অণু বলায় আমি আর না করিনি।

কাল ছুটি বলছি বটে, কিন্তু গুপ্তসাহেব যে পরিমাণ হাইপার হয়ে আছেন, তাতে আমার ভয় হচ্ছে উনি না আবার ডেকে পাঠান! আসলে ফলতার কাজটায় গতকাল টেকনিক্যাল সব পেপার সাবমিট করে দেওয়া হয়েছে। আর তারপর থেকেই গুপ্তসাহেব আমার পিছনে লেগেছেন প্রাইস নিয়ে। আজ যখন অফিস থেকে বেরোচ্ছিলাম হরনারকে নিয়ে, তখনও বলেছেন একবার।

আমি বলেছিলাম, "স্যার, ওরা আমাদের অফার রিভাইস করে তারপর টেকনিকালি ও কে করার পর তো প্রাইস দেব। আমাদের তো মিনিমাম একমাস সময় আছে।"

"তুমি কি আমায় মারবে?" গুপ্তসাহেব চিৎকার করে উঠেছিলেন।

আমি কেন যে সব কিছু ছেড়ে ওঁকেই মারতে যাব, কে জানে! মনে হয়েছিল বলি যে, আমার অন্য অনেক কিছু করার আছে। কিন্তু বলিনি। বরং ওঁকে আশ্বস্ত করার জন্য বলেছিলাম, "স্যার, আমাদের তো বেসিক কোয়ান্টিটি বের করাই আছে। তাই প্রাইস বের করতে সময় লাগবে না।"

গুপ্তসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন, "তারপর হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার করবে আর কী! তোমার তো আবার প্রেমে পড়ে মাথার ঠিক নেই!"

আশ্চর্য লোক বাবা! আমি ওঁকে এসব কথা বলিইনি, কিন্তু উনি নিজে থেকে কীসব যে ধরে নিয়েছেন, ভগবান জানে! অবশ্য এটা উনি শুধুই যে আমাকেই বলেন তা নয়, অফিসসুদ্ধু সবাইকে গুপ্তসাহেব এমন করেই কথা বলেন।

শান্ত গলায় বলেছিলাম, "স্যার, কী যে বলেন! একদিনই অমন ভুল হয়েছিল। তা বলে কি আর রোজ রোজ এমনটা হবে নাকি?"

"তোমাকে বিশ্বাস নেই। তা কাল যদি আসতে হয়, আসতে পারবে?"

ব্যাজারমুখে তাকিয়েছিলাম ওঁর দিকে। প্রাইভেট কোম্পানিগুলো আসলে স্লেভারিকেই আরও মডিফায়েড আর চার্মিং প্যাকেজিং-এ মুড়ে ফেরত নিয়ে এসেছে। টাকা দেয় বলে সবসময় একদম অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

আমি বলেছিলাম, "স্যার, কাল তো স্যাটারডে, ছুটি। আর তার উপর নিউ ইয়ার। তাই..."

"তো? আমি আসতে পারলে তুমি পারবে না কেন? আমার দুই মেয়ে বিদেশ থেকে এসেছে। আমার নাতিরা বায়না করছে তাদের সঙ্গে কাল ঘুরতে যেতে হবে। আমি কি সেসব শুনছি? আর তুমি? না হয় প্রেমই করো, তা বলে প্রেমিকাকে একদিন বলতে পারবে না যে, কাজ আছে?"

কাটা ঘায়ে এভাবে নুনের ছিটে দিতে নেই। আমার রাগ হচ্ছিল খুব। মনে হচ্ছিল, জামার ভিতর থেকে পইতেটা বের করে দিই ছুঁড়ে এক মোক্ষম অভিশাপ যে, আসল সময়ে তোমার ওই দামি গাড়ির চাকা কেএমডি-র খোঁড়া রাস্তায় বসে যাবে! কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, পলিউশন না গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঠিক জানি না, কিন্তু কোনও একটা কারণে আজকাল ঠিক কাজ করে না অভিশাপগুলো! তাই দরকার হলে আসব বলে মাথা নামিয়ে নিয়েছিলাম।

গুপ্তসাহেব বলেছিলেন, "ঠিক আছে। আমার মায়ের কাছে ওটা দিয়ে দিয়ো কেমন?"

যাদবপুর থানার সামনে আবার সিগনালে আটকে গেলাম! আসলে এটা সিগনালের দোষ নয়। দোষ আমার কপালের! সেই ছোট থেকেই লক্ষ করেছি, পৃথিবীর সমস্ত সিগনাল আমায় দেখলেই কেন জানি না খেপে লাল হয়ে যায়! আমার এক মামা তো বলত, "তোকে সঙ্গে নেব না। তবে আমাকেও সারা শহরের সিগনাল খেতে খেতে যেতে হবে।" আর আমার বন্ধুরা বলত, "সিগনালের আর দোষ কী, তোর নামটাই এমন যে..."

গুপ্তসাহেব বলেছেন যে, সন্ধে সাতটার ভিতর ওঁর মায়ের কাছে প্যাকেটটা পৌঁছে দিতে হবে। তারপর নাকি মা বেরিয়ে যাবেন ট্রেন ধরতে। কোথায় যেন উনি আর ওঁর ছোট ছেলে ঘুরতে যাচ্ছেন। এখনই সাড়ে ছ'টা বাজে। জানি না কতক্ষণে পৌঁছোব! তাড়াহুড়োয় ওঁর মায়ের মোবাইল নম্বরটা আনতে ভুলে গিয়েছি । যদিও অ্যাড্রেসটা এনেছি। আসলে দক্ষিণ কলকাতাটা আমি ঠিক চিনি না। চিরকাল উত্তরে মানুষ। কলেজ স্ট্রিট, হেদুয়া, শ্যামবাজার, মানিকতলা নখদর্পণে থাকে। কিন্তু দক্ষিণ বড্ড গুলিয়ে যায়! এখানে কেন যেন সবকিছুই একটু ল্যামিনেটেড আর প্লাস্টিকের তৈরি। আর তার উপর যাদবপুরের ভিতরগুলো তো কেমন যেন চোরা পকেটের মতো! বাড়িঘর খুঁজে পাওয়াই মুশকিল!

আমি এখন একটা ব্লুটুথ হেডসেট কিনেছি। সেটা বাঁ কানে গুঁজে নিয়ে ঘুরি। কারণ, এই বাইক চালাতে চালাতে পকেট থেকে মোবাইল বের করে কথা বলা সম্ভব হয় না। ছোট্ট জিনিসটা কানেই গোঁজা থাকে। আমি সেখানেই ফোনের পিকপিক শুনতে পেলাম। কলটা রিসিভ করলাম।

"লাল, হোয়্যার আর ইউ? তুমি কি আমায় মারবে?" গুপ্তসাহেবের গলাটা যেন সারা কলকাতা চিরে এসে আমার কানে গেঁথে গেল।

"স্যার, সিগনালে ফেঁসে গিয়েছি," বিরক্ত গলায় বললাম।

"জানতাম, তুমিই আমায় মারবে! তোমায় কেন যে রিক্রুট করলাম

আমি! এখন আমিই সবচেয়ে ভুগছি! একটা প্যাকেট এখনও পৌঁছোতে পারলে না?" গুপ্তসাহেব ওঁর রাগটা আর গুপ্ত রাখলেন না।

আমারও রাগ হয়ে গেল। মনে হল বলি, আমায় কি কোম্পানি ক্যারিয়ার বয় হিসেবে চাকরি দিয়েছে? আর আপনার মা যাবেন তো আপনি আসুন। কোম্পানি তো আপনাকে দশ লাখ টাকার গাড়ি চড়তে দিয়েছে। কিন্তু আপনি সল্টলেক থেকে এখানে না এসে কেন আমাকে পাঠিয়েছেন? কেন? আর কলকাতার ট্র্যাফিক সিগনালগুলো তো আমার বাপের সম্পত্তি নয় যে, আমি গেলেই সব পটাপট গ্রিন রেভলিউশন নিয়ে আসবে! মনে হল, প্যাকেটটা সামনে দাঁড়ানো সাদা হেলমেট পরা ভুঁড়িওয়ালা ওই ট্র্যাফিক পুলিশটাকে দিয়ে বলি, "বউদিকে দেবেন দাদা। নিউ ইয়ারের গিফ্‌ট আছে!" শালা কিছু বলি না বলে সব কি মাথায় উঠে গিয়েছে?

কিন্তু এসব না বলে বললাম, "স্যার আপনাকে কেন, আমি কোনও মশাকেও মারতে চাই না। আপনি একটু হোল্ড করুন, আমি ওই ট্র্যাফিক সার্জেন্টকে ফোনটা দিচ্ছি। তাকে বুঝিয়ে বলুন যেন সিগনালটা গ্রিন করে দেয়।"

"মানে?" গুপ্তসাহেব চিৎকার করলেন। বুঝলাম, সবারই মাঝে মাঝে ডিকশনারির দরকার পড়ে।

"স্যার সিগনাল ছেড়েছে। আমি আপনাকে পরে ফোন করছি," ফোনটা কেটে বাইকে স্টার্ট দিলাম।

এইট-বি থেকে ডানদিকে বাঁক নিয়ে যাদবপুরের চোরা পকেটে ঢুকে কিছুটা গিয়ে একটা মিষ্টির দোকান আছে। তার পাশেই স্যারের মায়ের বাড়ি। ভেবেছিলাম, খুঁজতে হবে। কিন্তু খুঁজতে হল না একদম।

বাড়িটা বেশ বড়। বোধহয় বলাই ছিল। কারণ, বেল বাজাতেই একজন মোটা কাজের মহিলা এসে আমার নাম জিজ্ঞেস করে, হাত থেকে প্যাকেটটা ছিনিয়ে নিয়ে প্রায় মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল! থতমত খেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। এ কী রে ভাই! এরা এত

অভদ্র কেন? আমি কোম্পানির প্রোজেক্ট ম্যানেজার। আমার একটা মিনিমাম সম্মান তো আছে। সেটাও কি গুপ্তসাহেব বলেননি? মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। কারও হয়ে কিছু করে দেওয়াও তো দেখছি আজকাল খুব অন্যায়!

বাইকটা ঘুরিয়ে আমি আবার এইট-বির সামনে এলাম। প্রায় সাতটা বাজে। অটো স্ট্যান্ডের কাছে অণুর দাঁড়ানোর কথা। কিন্তু ও এখনও আসেনি। হেলমেটটা খুলে সিটের উপর রেখে দাঁড়ালাম। সামনের মোড়টায় একদম গিঁট লেগে গিয়েছে। বাস, ট্যাক্সি, ছোট-বড় গাড়ি, রিকশা-অটোয় মোড়টার, প্রথম নিজে নিজে ভাত খেতে শেখা বাচ্চার থালার মতো অবস্থা হয়ে আছে। কী করব বুঝতে না পেরে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই কী আশ্চর্য, দাদা ফোন করল! ধরব? আমার মুখটা বিরক্তিতে বেঁকে গেল। আবার সেই এক ঘ্যানঘ্যান শুনতে হবে!

সেই রাতের পরের দিন ভোরবেলায় প্রায় ছ'টার সময় দাদা এসে হাজির হয়েছিল আমার কাছে। তার আগের দিন ভাল ঘুম হয়নি আমার। মানসিক অস্থিরতার কারণে ভোর থাকতেই উঠে পড়েছিলাম। জানলায় বসে মনমরা হয়ে বাগানের ফুল দেখছিলাম আর ঠিক তখনই উসকো-খুসকো অবস্থায় গাড়িটাকে গেটের বাইরে পার্ক করে দাদাকে আসতে দেখেছিলাম। দাদা আমার ঘরে এসে প্রায় সবকিছু চলে গিয়েছে এমন ভাব নিয়ে ধপাস করে বসে পড়েছিল বিছানায়। তারপর আমায় কোনও কথা বলতে না দিয়েই হঠাৎ হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিয়েছিল। প্রাথমিকভাবে বিরক্ত লাগলেও পরে কষ্ট হচ্ছিল। যতই হোক, আমি তো জানি, দাদা কেমন নরম সরম মানুষ। কাউকে বকতে পারে না। জোরে কথা বলতে পারে না। বরং সবসময় সবাইকে খুশি করতেই ব্যস্ত। এমএ-তে ভাল নম্বর ছিল। সবাই বলেছিল ডক্টরেট করতে। দাদার নিজেরও তাই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বাবা চেয়েছিল যে, দাদা ব্যবসায় জয়েন করুক। বলেছিল, "জানি, তুই টেকনিক্যাল লোক

নোস। কিন্তু টেকনিক্যাল কিছু তোকে দেখতে হবে না। অ্যাকাউন্টস আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখবি।"

দাদা খুবই অনিচ্ছের সঙ্গে রাজি হয়েছিল। আসলে বাবার উপরে কথা বলতে পারে না যে! আমি দাদাকে বলেছিলাম, ও যেন পড়াশোনা চালিয়ে যায়, যেন ব্যবসায় জয়েন না করে। কিন্তু দাদা বলেছিল, "বাবা রাগ করবে রে। আমি পারব না।"

বাবা রাগ করলে করবে! তাতে আমি কেন আমার জীবনটা পালটাব? কিন্তু দাদা এসব শুনতেই চায়নি। দাদা কেন যে বাবাকে এত ভয় পায়! আমি সেদিন সকালেও বুঝেছিলাম যে, যতটা না শ্রী চলে যাওয়ার দুঃখে দাদা এসেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বাবাকে ভয় পেয়ে এসেছে।

দাদা শান্ত হওয়ার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কী রে, এমন করে এসেছিস! ব্যাপারটা কী?"

"আমায় সকালেই একবার কোর্টে যেতে হবে। একটা অফিশিয়াল কাজে। তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম। আসলে বাবাকে বলেছি যে, শ্রী একটু বাপের বাড়ি গিয়েছে। কিন্তু বাবা যদি আসল ব্যাপারটা জানতে পারে, তবে আমায় খুব বকবে রে!"

শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কী হয়েছে? হঠাৎ এমন হল কেন?"

দাদা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, "একটা মেয়ের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। আমাদের ক্লায়েন্ট। তা সেটা শ্রী দেখে ফেলেছে। আর এমন সময় দেখেছে, যখন মেয়েটা আমার হাত ধরে রাস্তা পার হচ্ছিল।"

"কী?" আমি ভুরু কুঁচকে দাদার দিকে তাকিয়েছিলাম।

"আর বলিস না। আমাদের একটা কাজ হবে ইউ পি-তে। ওখানকার এক ঠাকুর, মানে, ওই বাহুবলি টাইপ, পলিটিকালি ওয়েল কানেক্টেড, সাংসদও। সে একটা প্লাইউডের ফ্যাক্টরি দেবে। আমরা সিভিলসহ গোটা কাজটা টার্নকি বেসিসে পেয়েছি। তার মেয়ে বিদেশে পড়াশোনা করেছে। এখন বাবার ব্যাবসা দেখে। ও এসেছে কলকাতায় আমাদের

সঙ্গে কাজ নিয়ে কথা বলতে। তা আমায় ধরেছিল যে, কাজের শেষে শপিং করবে বলে। আমি ম্যানেজার ঘনশ্যামকে এগিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার সঙ্গেই বেরোবে বলে জেদ ধরেছিল। ব্যস, বেরিয়েছে আর জাস্ট ক্যাজুয়ালি আমার এই বাইসেপের কাছটা ধরে রাস্তা পার হচ্ছিল। আমারও কপাল খারাপ। সারা কলকাতা থাকতে তখন ওখানটা দিয়েই গাড়িতে পার হচ্ছিল শ্রী। আর যাবে কোথায়? জানিস, ও আমায় বলেছে, আমি নাকি উওম্যানাইজার, লম্পট। আমার নাকি ছোঁক ছোঁক করার বাতিক। বলেছে, বাবাকেও বলে দেবে।"

"এই জন্য তোকে ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে?" আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম দাদার দিকে।

"লক্ষ্মী ভাইটি, আমার হয়ে তুই একবার যাবি? গিয়ে ওকে বোঝাবি একবার?"

"আমি?" বাইরের দিকে তাকিয়ে আমার হঠাৎ কেন কে জানে মিকির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন মনটা নেতিয়ে পড়েছিল একদম।

"তোর সঙ্গে তো ওর বন্ধুর মতো সম্পর্ক। যা না একবার।"

ক্লান্ত, অনিচ্ছুক গলায় বলেছিলাম, "দ্যাখ, রাগ পড়লে আবার চলে আসবে। ঝুটমুট টেনশন নিস না।"

"এ কি গাড়ি নাকি যে, পেট্রল ফুরিয়ে গেলে থেমে যাবে? শ্রীকে জানিস না কেমন জেদি? প্লিজ লাল, তুই যা না। আমার উপর তোর রাগ কীসের? যা হয়েছে, তা তো বাবার সঙ্গে হয়েছে।"

"সে জন্য নয়," আমার বিরক্ত লেগেছিল। তারপর দাদাকে চুপ করাতে বলেছিলাম, "ঠিক আছে, আমি কথা বলব। বললাম তো, তুই ফালতু টেনশন নিস না।"

দাদা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে আমার ঘরটা দেখেছিল। তারপর ধীর গলায় বলেছিল, "নিজের অত বড় বাড়ি ছেড়ে এ কোথায় এসে উঠলি লাল? নিজেদের ব্যাবসাটা ছাড়লি? কার জন্য করলি এসব?

বাড়িতে ফিরবি না? আমার ভাল লাগে না রে।"

হঠাৎ এমন কথা শুনে দাদার দিকে তাকিয়েছিলাম।

দাদা উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "আমি গত পরশু মিকিকে দেখেছি নিউ মার্কেটে। একটা ছেলের সঙ্গে গাড়িতে উঠছিল। লাল রঙের গাড়ি। জানি না কী কেস। জানি না, তুই জানিস কিনা। তবে মনে হল তোকে বলি, তাই বললাম।"

চোয়াল শক্ত করে নিজেকে সংযত করেছিলাম। তারপর দাদার দিক থেকে দৃষ্টিটা বাগানের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছিলাম, "ও কিছু না। আমি জানি। ওরা বন্ধু। ছেলেটার নাম স্যাম।"

"ও!" দাদা মুখ নামিয়ে নিয়েছিল। তারপর বলেছিল, "তবু, সম্ভব হলে বাড়ি চলে আসিস। রাগ করে কী হবে বল তো? কার উপর রাগ করছিস লাল? জানিস তো, বাবার শরীর। আমি জানি বাবা যতই উপরে উপরে নিজেকে গম্ভীর আর শক্ত দেখাক, তোকে মিস করে খুব। অত ইগো দেখাস না। নিজের হাত কাটলে নিজেরই ব্যথা লাগবে।"

ব্যথা! আমার চোয়াল আবার শক্ত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক আছে। সে আমি বুঝে নেব। জীবনে আমি বরাবরই খুব একা। মায়ের চলে যাওয়ার পর থেকে তো আরও কেমন যেন নির্জন লাগে আমার। শুধু মিকিকে দেখে আমার আর একা থাকতে ইচ্ছে করেনি। কিন্তু এখন আবার আমি একা হয়ে গিয়েছি। জানি, কীভাবে একা থাকতে হয়। দাদা যাই বলুক, আমি আর বাড়ি ফিরব না।

তবে দাদার কথা অনুযায়ী আমি ফোন করেছিলাম শ্রীকে। শ্রী আমার ফোন পেয়ে খুব উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই বলেছিল যে, ও জয়পুর গিয়েছে বাবা-মায়ের সঙ্গে। ফিরে এসে কথা বলবে। জয়পুর? আমার অবাক লেগেছিল খুব। শ্রী হঠাৎ ওখানে চলে গিয়েছে ঘুরতে? দাদা তো জানেই না! এটা কী করে হল? আমি জিজ্ঞেস করতে গেলেও শ্রী আর কোনও কথাই বলেনি। ফিরে এসে ও-ই কনট্যাক্ট করবে বলে ফোনটা কেটে দিয়েছিল। বুঝেছিলাম, দাদার কপালে দুঃখ আছে।

দুঃখ সবার কপালেই থাকে। শুধু সেটার ইনটেনসিটি বাড়ে আর কমে! মানুষ তার সারা জীবনকালে কতটা সময় আনন্দে থাকে? অধিকাংশ মুহূর্তে কি তার নানা না-পাওয়ার কথা মনে পড়ে না? পড়েই তো। আমি জানি, খুব পড়ে। রাস্তায় বেরোলেই তাই তো আমি সব গম্ভীর আর রামগড়ুরের বংশধরদের দেখতে পাই! মনে হয়, সবাই খুব চিন্তিত। সিরিয়াস। মনে হয়, হাসলেই বুঝি তাদের একুশ টাকা জরিমানা হবে! আর সকলে যার যার একুশ টাকা বাঁচাবে বলেই যেন সর্বদা তটস্থ, উৎকণ্ঠিত!

আমি এই দুঃখের, উৎকণ্ঠার শহরটা ছেড়ে পালাতে চাই। জরিমানাহীন একটা শহরে যেতে চাই!

"সরি সরি," পাশ থেকে অণুর গলা শুনে মুখ ফেরালাম। অণু হাসি হাসি মুখ করে এসে পাশে দাঁড়াল। বলল, "আসলে নিলয়ের সঙ্গে আইসক্রিম খেতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।"

আমি নিলয়কে দেখলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার পিত্তি জ্বলে গেল।

"হাই লালে লাল?" নিলয় এমন ভাব করল যেন টিভির কোনও লাফটার শো-এ এসেছে।

"বলুন," আমি আমার কাঠের হাসির বদলে এবার একটা কাঠের মুখ বের করলাম! আর 'আপনি'টা বজায় রেখে জানিয়ে দিতে চাইলাম যে, আমার ট্রাকের পিছনে 'কিপ সেফ ডিসটেন্স' লেখাটা যেন ও দ্যাখে!

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্ররা যে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেই চলেছে! আমার কোনও লেখাই ও দেখতে বা বুঝতে পারল না। বরং খুব যেন মজা করছে, এমন মুখ করে বলল, "শুনলাম, তুমি ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের কলেজ থেকে প্রতি বছর প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার বের হয়। তারা সবাই কেমন যেন নীরস হয়। তুমিও কি তাই?"

ভাবলাম বলি যে, নিলয় যদি রসের নমুনা হয়, তবে আমি নীরসই ভাল। কিন্তু কিছু না বলে হ্যাঁ আর না-এর মাঝামাঝি একটা ঘাড় নাড়লাম।

নিলয় বলল, "তো চলো তা হলে আমরা যাই।"

"মানে?" অবাক হয়ে তাকালাম। নিলয় যাবে মানে? কোথায় যাবে? আমায় তো অণু বলেছিল যে, ও যাবে। নিলয় যাবে তো বলেনি! আর আমার মোটরবাইকটাকে কি ও ট্যাক্সি ভেবেছে নাকি যে, যত জন খুশি ওঠা যায়?

"আরে," নিলয় এগিয়ে এসে আমার পিঠে চাপড় মারল, তারপর বলল, "তুমি মাইরি ইয়ারকিও বোঝো না! অমিত রায়ের মতো বলতে হয় যে, তোমার সঙ্গে ইয়ারকি মেরে পি এস ঠাট্টা লিখতে হবে। আরে বাবা, আমি যাব না। তোমরা দু'জনেই যাও। আমি ফালতু হাড্ডি হয়ে কাবাব মাটি করি কেন!"

কাবাব? হাড্ডি? এসব কী বলছে নিলয়? কে হাড্ডি আর কাবাবটাই বা কারা? আমি আমিষ গন্ধে নাক কুঁচকে উঠলাম। ও কি অন্যরকম কিছু ভাবছে? এ তো মহা মুশকিল হল দেখছি! কিন্তু আমি বুঝলাম, এর প্রতিবাদ করা মানে নিলয়কে আরও প্রশ্রয় দেওয়া।

অণু এবার কথা বলল, "চলো তো তাড়াতাড়ি। দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

আমিও সময় নষ্ট করলাম না। বাইকে বসে অণুকে বসিয়ে নিলাম।

অণু নিলয়কে বলল, "তা হলে আসি?"

এতক্ষণ স্মার্ট আর চনমনে দেখানো নিলয় হঠাৎ কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেল। মনে হল, ওর মুখে লোডশেডিং হয়ে গেল হঠাৎ। ও ন্যাতানো দৃষ্টিতে অণুকে দেখে বলল, "আসবে? ও... আচ্ছা, এসো।"

অণু একহাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, "চলো লাল," তারপর নিলয়কে বলল, "বাই।"

অণুর হাতটা আমার কোমরের কাছে রয়েছে। আর আমার গলাটা কেমন যেন হঠাৎ শুকিয়ে গেল! নিশ্চয়ই হাওয়ার জন্য। কোনও কথা না বলে রাস্তায় ছড়ানো গাড়িগুলো কাটিয়ে যথাসম্ভব জোরে বাইক ছোটালাম।

কিছুটা আসার পরে হাতটা সরিয়ে নিয়ে অণু হঠাৎ বলল, "ডোন্ট

মাইন্ড। আসলে নিলয় আমাকে প্রোপোজ করেছে গত চারদিন আগে। তাই ওকে কাটানোর জন্য আমি বলেছিলাম যে, আমি তোমার সঙ্গে এনগেজড। তাই একটু এমন করতে হল।"

"অ্যাঁ? কী?" কথার আকস্মিকতায় আমি থতমত খেয়ে গেলাম।

"হ্যাঁ, ওকে দেখানোর ছিল যে, আমরা কাপ্‌ল। তাই তোমায় আসতে বলেছিলাম। জানি, তোমায় কথাটা তখন বললে তুমি আসতে না। তাই... মানে সরি... এভাবে হয়তো..."

অণুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি বললাম, "কেন? ওকে না বললেই তো পারতে, যদি ইচ্ছে না থাকত।"

অণু বলল, "ও শোনার ছেলে নয়। খুব বিরক্ত করছিল। তাই প্রমাণ দিতে... সরি লাল।"

আমার শুকনো ভাবটা গলা ছেড়ে কেমন যেন বুকেও নেমে গেল। ও, অণু এই জন্য আমায় আসতে বলেছিল! আমায় ব্যবহার করল এভাবে? না, মানে ব্যবহার নয়... কিন্তু... তা হলে আমি ওর কাছে জাস্ট... ঠিক বুঝতে পারলাম না আমার মন কী বলতে চাইছে! শুধু বুঝলাম আমার বুকের ভিতরটার শুষ্কতা বাড়ছে হু হু করে। নদীটা মরে আসছে দ্রুত। আর তার সঙ্গে জলের অভাবে শুকিয়ে আসছে বুনোফুলের ঝোপ।

আমি কথা বলতে গেলাম। কিন্তু কোথা থেকে যে একটা জিরাফের মতো লম্বা শ্বাস বেরিয়ে এল কে জানে! অবাক হয়ে ওই উটকো শ্বাসটাকে সামলে অণুকে জিজ্ঞেস করলাম, "তা হলে? বাড়ি যাব তো এখন?"

অণু কথাটার জবাব না দিয়ে হঠাৎ বলল, "কুসুমিকা কে লাল? তোমার প্রেমিকা?"

সাত

আজ পুডিং-এর মতো কুয়াশা পড়েছে কলকাতায়। আজকাল সকালে আমি দৌড়োতে যাই। আর রাত করে মুভি দেখি না। কারণ, চোখটা গন্ডগোল করছে। তাই ডাক্তারের পরামর্শমতো তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাই। সকালে উঠতে ভালই লাগে। বেশ একটা ফাঁকা আর বাচ্চা ছেলের মতো আড়মোড়া ভাঙা কলকাতাকে পাওয়া যায়। খবর কাগজওয়ালাদের সাইকেল, পথের পাশের দোকানির উনুনের আঁচ, মর্নিং স্কুলের বাচ্চাদের ঘুম পায়ে হাঁটা আর হলুদ ট্যাক্সির পিঠে চড়ে আসা একটা দিন। সকালে না উঠলে এগুলো জানতেই পারতাম না। আমি চিরকাল নর্থের ছেলে। গাঁ ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকা আমার স্বভাব। এই দক্ষিণ একটু কেমন যেন আলগা। যেন ফাঁকা জায়গা একটু বেশি। তার মধ্যে দিয়ে হাওয়াদের আনাগোনাও বেশি। জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, এই সকাল আটটাতেও বাগানের ফুলগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কুয়াশায়। জানুয়ারির মিড্‌ল এখন। কিন্তু হঠাৎ শীত কমে গিয়েছে অনেকটা।

আজ আমার বাবার জন্মদিন। এসব আমার খুব মনে থাকে। আমার মনে আছে, মা এদিনে পুলিপিঠে বানাত। বাবার এই পিঠেটা খুব প্রিয়। গত বছর অবধি শ্রী করে দিত। কিন্তু আজ কে করে দেবে সেসব? একদম অজানা এক কষ্ট আচমকা পাক দিয়ে উঠল ভিতরে। কেন যেন মনে হল, আমি বড্ড বেশি স্বার্থপর। চিরকাল আমার আমার করেই গেলাম। বাবার কষ্টটা কোনওদিন দেখলাম না। মানুষের মন যখন দুর্বল থাকে, তখন সে কিছুটা হলেও যেন অন্যরকম ভাবতে পারে। আমার মন কি আজ তেমনই দুর্বল হয়ে আছে? একবার ঘরের দিকে চোখ ফেরালাম। এই ঘরটার দ্বিগুণ একটা ঘরে আমি আগে থাকতাম। জানি, আজও সেই ঘরটা পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখেছে মনুদি। কিন্তু এটাও জানি, আমার আর ওখানে ফেরা হবে না। কখনও কখনও মানুষের

মনে একটা অনুভূতিহীন অবস্থা আসে। আমার এখন মিকির জন্য সেরকম একটা ভাব এসেছে। ওর কথা মনে পড়লে আর বুকের রক্ত চলকায় না। পেটটা খালি খালি লাগে না। শুধু কেমন যেন তেতো লাগে মুখটা। লেবেল ক্রসিং-এ আটকে থাকা মানুষ যেভাবে নব্বই বগির মালগাড়িকে দেখে, আমিও সেভাবে তাকিয়ে থাকি স্মৃতির দিকে! বাবা আমাকে এমন কথাই বলেছিল না?

গত বছর পুজোর পর থেকেই হঠাৎ বাবা উঠেপড়ে লেগেছিল আমার বিয়ে দেওয়ার জন্য। আর ঠিক দাদার মতোই একরাতে খেতে বসে ঘোষণা করার ঢঙে বলেছিল, "লাল, এবার তোর বিয়ে দেব।"

"না", আমি প্রতিবাদ করতে একমুহূর্তও সময় নিইনি।

বাবা এমন কথায় অভ্যস্ত নয়, তাই কিছুটা অবাক হয়েই বলেছিল, "কী বললি?"

আমি স্থিরগলায় বলেছিলাম, "বলছি, তোমায় বিয়ে দিতে হবে না। আমার পছন্দ করা আছে।"

"ও!" বাবা খাওয়া থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

"মেয়েটির নাম কুসুমিকা বাসু। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। কেমিস্ট্রি অনার্স।"

"বাসু? মানে বোস?" বাবার গলা শক্ত হয়ে গিয়েছিল।

"হ্যাঁ, বোস," আমিও শক্ত চোখে তাকিয়েছিলাম বাবার দিকে।

"কায়েত? তুই কায়েতের মেয়ের সঙ্গে ভাব করেছিস?" বাবা এমন করে বলেছিল, যেন আমি একটা বিরাট জেনোসাইড করে ফেলেছি!

"তো?" আমি গলার কাঠিন্য বিন্দুমাত্র কমাইনি।

"এ বিয়ে হতে পারে না। আমি বেঁচে থাকতে হতে পারে না!" বাবা হাতের খাবার ফেলে চোয়াল শক্ত করে উঠে গিয়েছিল।

আমিও রাগ করে পালটা দিতে চাইছিলাম কিছু একটা। কিন্তু শ্রী আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছিল।

তারপর বাবা চলে যেতেই বলেছিল, "কেন মুখে মুখে তর্ক

করছ লাল? সময় দাও না, দেখো না কী হয়! পরে এই নিয়ে কথা বোলো।"

আমি অবশ্য জানতাম যে, পৃথিবীর সমস্ত সময় দিলেও বাবার মত পালটাবে না। এই সময়েও যে কেউ এতটা গোঁড়া থাকতে পারে, ভাবতেই পারি না।

সেই রাতের পর থেকে বাবা আমার সঙ্গে যেটুকু কথা বলত, প্রায় সেটাও বন্ধ করে দিয়েছিল। দরকারি সব কথা দাদার মাধ্যমে আদান-প্রদান করত। অফিসটা কেমন যেন আমার কাছে শাস্তি হয়ে উঠেছিল! কেন যে মরতে সেন্টিমেন্টাল হয়ে চাকরি ছেড়ে এসে বাবার ব্যবসায় যোগ দিয়েছিলাম, সেটা ভাবলেই মাথায় খুন চাপত! আমি কাউকে না জানিয়ে তলায় তলায় আবার চাকরির খোঁজ করতে শুরু করেছিলাম। আর ভাগ্য ভাল ছিল যে, বেশি খুঁজতেও হয়নি। পোদ্দার কনস্ট্রাকশন থেকে আমার ডাক আসে ইন্টারভিউতে। আর সেখানে গুপ্তসাহেব আমায় পাঁচজনের মধ্যে থেকে বেছে নেন।

কথাটা বাবার কানে যেতে সময় লাগেনি। আর তারপরই এক রাতে ওই খাবার টেবিলেই বাবা বলেছিল, "অপদার্থ সন্তান হল বাবা-মায়ের অশেষ দুঃখের কারণ। আমি ভাবতে পারিনি, আমাকেও এমন ভুগতে হবে। একটা মেয়ের জন্য কেউ নিজের রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে? নেমকহারামি করে? ছিঃ। আমি এমন সন্তানের বাবা?"

কথাগুলোর ভিতরে কারও নাম না থাকলেও ওগুলোর লক্ষ্য যে আমি, তা বুঝতে কোনও একস্ট্রা অর্ডিনারি ব্রেন লাগে না। তবু চুপ করে ছিলাম।

কিন্তু বাবা আবার বলেছিল, "এত নিচু মন কোনও ছেলের হয়? একটা মেয়ের জন্য সে সব কিছু এমনভাবে ভাসিয়ে দিতে পারে? আমাদের কারও কথা তার মনে পর্যন্ত পড়ে না? সে লুকিয়ে লুকিয়ে চাকরি নেয়? কত মুরোদ হয়েছে তার? কতটা পাখা গজিয়েছে?"

আর থাকতে পারিনি। চোয়াল শক্ত করে বলেছিলাম, "মিকিকে

বিয়ে করতে হলে আমায় যা-যা করতে হয়, সবটা করব। কেউ আমায় আটকাতে পারবে না।"

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "এসব নোংরামো আমার বাড়িতে থেকে চলবে না। আমার বাড়িতে থাকতে হলে আমার কথা মেনে চলতে হবে। নইলে যার ইচ্ছে, সে আসতে পারে। আর তুই এমন বলছিস তো? দেখবি, একদিন ওই মেয়েটার কথা মনে পড়লে তোর মন তেতো হয়ে যাবে। একদম বিস্বাদ হয়ে যাবে তোর জীবন।"

আজ পুডিং-এর মতো কুয়াশায় ঢেকে আছে শহর। আমার মনের ভিতরও সব কেমন যেন আবছা হয়ে আছে কুয়াশায়! মিকি কোথায় এখন? কার জন্য ঘর ছাড়লাম আমি?

আমি জানি, পৃথিবীতে কোনও মানুষের অন্য কোনও মানুষকে বোঝার দায় নেই। তবু মানুষ সম্পর্কের জোরে একটা দায় গড়ে তুলতে চায়। একটা সেতু গড়ে তুলতে চায়। আমি ভেবেছিলাম যে, আমার আর মিকির মধ্যে সেটা গড়ে তুলতে পেরেছি। কিন্তু আমার যে কী ভুল হয়েছে! হ্যাঁ, মিকি বলতেই পারে, ও আমাকে বাড়ি ছাড়তে বলেনি। আমাকে বিয়ে করতে চায়, তাও বলেনি। কিন্তু আমি তো ওকে বলেছিলাম। তখন তো খুব হেসে আদুরেভাবে আমায় জড়িয়ে ধরেছিল। আমার ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলেছিল, "ইস, তোমার ঠোঁট দুটো এত ছোট্ট আর লাল যে, মনে হয় সারাজীবন আমার কাছে রেখে দিই তোমায়!" সারা জীবন নিজের কাছে রেখে দেওয়া মানে কি লেকের পাশে এক ঘণ্টা হাত ধরে বসে থাকা? না ইডেন গার্ডেনে এ ওর কাঁধে মাথা রেখে বসা? সারাজীবন সে থাকতে চাইছে, আমি তাকে স্পষ্টভাবে বিয়ের কথা বলায় সে আপত্তি করছে না, তাকে আমি কী বলব? কী বলবে যে-কোনও সাধারণ মানুষ?

মিকির কথা ভাবলে এখন আমার নিজেকে কেমন যেন বোকা মনে হয়! মনে হয়, আমি খেলার পুতুল ছিলাম। যে ক'দিন ইচ্ছে হয়েছে,

খেলেছে। তারপর নতুন পুতুল দেখে ফেলে দিয়েছে আমায়। আসলে মনে হয়, ও আমাকে কোনওদিন ভালবাসেইনি!

"কী রে, কবিতা লিখবি নাকি?" দরজার কাছ থেকে গলা পেয়ে আমি ঘুরলাম। পটাই আমায় এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাসল।

"নাঃ, যা কুয়াশা, তাই দেখছিলাম।"

"শোন, আমি তোকে নেমন্তন্ন করতে এলাম। আমায় কনগ্র্যাট্স দে!" পটাই ঘরে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল।

"নেমন্তন্ন? কেন?" আমি অবাক হলাম একটু।

"আমি আর পিপি মিলে একটা কাণ্ড করেছি। তাই একটু সেলিব্রেট করব।"

"কাণ্ড? সে তো রোজই কিছু না-কিছু করছিস। আজ পিপি তোকে ঝাড় দিচ্ছে, কাল তুই মাল খেয়ে সারা বাড়ি বমি করে ভাসাচ্ছিস। এসব তো তোদের দু'জনের লেগেই আছে।"

"না রে," পটাই এসে আমার বিছানার ওপর সামান্য দয়া না দেখিয়ে মচাৎ করে বসল, "এসব নয়। আমি আর পিপি একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছি!"

সাসপেন্স একটা সময়ের পর কেমন যেন বিরক্তির জন্ম দেয়। আমি বললাম, "আর বাড়াবাড়ি করিস না। এমন ভাব করছিস যেন অ্যাটম বোমা বানিয়ে ফেলেছিস তোরা।"

"আরে না, না। সে তো নিষ্প্রাণ জিনিস। আমরা দু'জন না একটা বাচ্চা বানিয়ে ফেলেছি একেবারে!"

"কী?" আমি ঘাবড়ে গেলাম একটু। কেউ এভাবে এসব খবর দেয়?

"আমিও ঠিক এমন এক্সপ্রেশনই দিয়েছিলাম। তখন পিপি বলল, ও নাকি ডাক্তার দেখিয়ে আর টেস্ট করিয়ে কনফার্মড হয়েছে। আমি তখন বললাম, ও শিয়োর যে, এটা আমারই কাজ? সেই শুনে এমন এক পাটি স্টিলেটো ছুড়ল না রে মাইরি! আমি তো আনন্দে চুমুই খেয়ে ফেললাম ওকে!"

"তোর তার কেটে গিয়েছে? তুই জিজ্ঞেস করেছিস, এটা তোর বাচ্চা কিনা? পাগল তুই?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম পটাইকে।

"আরে, প্র্যাক্টিকাল হ লাল। তোর ইমপ্র্যাক্টিক্যালিটির জন্য আজ অমন বড় বাড়ি ছেড়ে এই দেশলাই বাক্সে পড়ে আছিস! আমি মোদো-মাতাল মানুষ। তার উপর আমার আর পিপির যা বপু, তাতে মেট করাই মুশকিল। আর সত্যি বলতে কী, ইন্টারেস্টও পাই না! তাও অ্যাক্সিডেন্টলি দু'-একবার হয়ে গিয়েছে আর তাতেই প্রোডাকশন সাকসেসফুল! আমি ভাবতেই পারছি না! শালা, তুই বিয়েই করতে পারলি না আর আমি একদম বাবা হয়ে গেলাম!" পটাই দু'হাত তুলে এমন করে ঝাঁকাল যেন জাক কালিসের উইকেট নিয়েছে।

আমি কিছু না বলে মাথা নিচু করলাম। একটা খারাপ লাগা আচমকা এসে মেঘ করল আমার মাথায়! সত্যিই তো, আমি কোথায় আছি আর আমার আশেপাশের লোকেরা কত এগিয়ে গেল! তারা ফ্ল্যাট কিনে ফেলল, গাড়ি কিনে ফেলল। সন্তান হয়ে গেল তাদের। আর আমি? পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকছি! প্রেমে হাফসোল খেয়ে সকালের কুয়াশা দেখে বোঁ হয়ে আছি! দিন-রাত বসের চিৎকার শুনছি! কিন্তু এমন থাকার কথা কি আমার ছিল? আমি খুব ভাল করে পড়াশোনা করেছি। চাকরিতেও মন দিয়েছি। যখন ব্যাবসা করেছি, সেটাতেও মন দিয়েছি। তবু রাগ করে প্রায় এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমি আমার ব্যাবসা করে রোজগার করা টাকার একটা আধুলিও নিয়ে আসিনি! আসলে পৃথিবী আর মানুষের ভিতরটা দিয়ে তাকে মাপে না। পৃথিবীর স্ট্যান্ডার্ড ইনডেক্স হচ্ছে টাকা, সম্পত্তি, স্থিতিশীলতা। এগুলোর চাপে আমার মতো মানুষগুলো নাস্তানাবুদ হয় প্রতি পদে। আর লোকে বলে পিয়ার প্রেশার!

আমার নিজেকে কেমন যেন গাধা মনে হল! মিকি কেমন যেন গাধা বানিয়ে ছেড়েছে আমাকে! পটাই আমার দিকে তাকিয়ে কি কিছু বুঝল? না হলে এমন করে হঠাৎ টপিক বদলাল কেন? আসলে আমরা যা খুশি

চিন্তা করতে পারি। কিন্তু চাই না যে, সেটুকু কেউ বুঝে ফেলুক!

পটাই জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁরে ভাল কথা, তোর মিকির কী খবর? কেমন আছে ও?"

আমি চোয়াল শক্ত করলাম। মিকির ব্যাপারটা কেউ জানে না। কাউকে বলিনি। কী হবে? সবাই তো এক একখানা এনসাইক্লোপিডিয়া চাপিয়ে দিয়ে যাবে মাথায়। ব্রেকআপ আর জ্ঞান একসঙ্গে বইতে পারব না।

বললাম, "আছে তো। সামনে পরীক্ষা, তাই একটু দেখাসাক্ষাৎ কম হচ্ছে আর কী!"

"ও এখানে এসে দেখে গিয়েছে, তুই কোথায় আছিস? তুই ওর জন্য কোন জায়গা ছেড়ে কোন জায়গায় এসে থাকছিস? দেখে গিয়েছে?" পটাই আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল।

"না, না," আমি জোর করে হাসলাম, "কাকিমা এমনিতে খুব ইনকুইজিটিভ। একবার যদি জানতে পারে না যে, আমার কোনও কেস আছে, একদম দফারফা করে ছাড়বেন। পার্সোনাল ব্যাপার আমি পার্সোনালই রাখতে চাই।"

পটাই আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, "শালা! যাক গে, কাল রাতে আমাদের ওখানে নেমন্তন্ন তোর। সবে প্রেগনেন্সি কনফার্মড হয়েছে তো, পিপির মা আর আমার মা বলল যেন এখনও কাউকে না বলি। মানে, তিন মাস যেন কাউকে না বলি। কিন্তু আমি আর পিপি ঠিক করলাম, তুই তো ঠিক মানুষ না, তাই তোকে বলাই যায়, কী বল?"

আমি হাসলাম, "পিপিকে সাবধানে রাখিস। এই সময়টা শুনেছি খুব ডেঞ্জারাস। মানে, মায়ের কেয়ারটা খুব ভাল করে করতে হয়।"

পটাই হাসল, "ওঃ, এমন মুখ করে বলছিস না, সাদা থান পরিয়ে দিলে তোকে একদম আমার খুড়িমা মনে হবে!"

"না রে, আমি শুনেছি।"

পটাই আবার প্রসঙ্গ পালটে বলল, "লাল, তোকে এমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে?"

আমি জোরে, গলায় প্রায় একস্ট্রা জেনারেটর লাগিয়ে হেসে বললাম, "এবার তোকে সাদা থান পরাতে হবে দেখছি!"

"শালা, তোকে আমি সেই স্কুল লাইফ থেকে দেখছি। তুমি মাল একা দাঁড়িয়ে কুয়াশা দেখার লোক? আমায় গান্ডু পেয়েছিস?" পটাই চোখ পাকাল।

"আরে, আমার কি বয়স বাড়ছে না? জানিস, কানের কাছে দুটো চুল পেকে গিয়েছে?"

"বাড়িতে গিয়েছিলি এর মধ্যে?" পটাই আবার প্রসঙ্গ পালটাল।

আমি কিছু বলার আগেই হঠাৎ আমার ফোনটা পিকপিক করে ডেকে উঠল। পটাইয়ের দিকে তাকিয়ে ওকে হাতের ইশারায় থামতে বলে টেবিল থেকে ফোনটা তুললাম। আরে, গুপ্তসাহেব!

"গুড মর্নিং স্যার, বলুন," অমায়িক গলায় বলার চেষ্টা করলাম।

"আমি এবার সবক'টাকে মেরে ফেলব!" গুপ্তসাহেব প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

আমি থতমত খেলাম। গঙ্গা উলটো বইছে কেন? হঠাৎ গুপ্তসাহেব অন্যকে মারার কথা বলছেন? তবে আমার ভাল লাগল। যাক, ফর আ চেঞ্জ অন্য কিছু তো বললেন! কিন্তু ভদ্রলোক এমন যুদ্ধবাজ কেন কে জানে! আগের জন্মে কি হিটলার ছিলেন?

আমি শান্ত গলায় বললাম, "স্যার, এমন উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? কী হয়েছে?"

"কী হয়েছে? জানো না কী হয়েছে? কোনও খবরই তো রাখো না। শুধু প্রেম করে বেড়ালে হবে? অফিসের কোনও খবর রাখতে হবে না?" গুপ্তসাহেব এমন করে বললেন যেন আমি ওঁর মেয়ের সঙ্গেই প্রেম করছি!

বললাম, "স্যার, কী হয়েছে বলবেন?"

গুপ্তসাহেব ঠান্ডা হলেন হঠাৎ, "এরা কী শুরু করেছে বলো তো লাল? মেহতারা কী শুরু করেছে? জানো, কী করেছে?"

"সেটাই তো জানার চেষ্টা করছি স্যার! আপনি একটু কম এক্সাইটেড হন। আপনার হার্টের কন্ডিশন তো ভাল নয়।"

"সেটা কি আর ওরা বুঝবে? জানো কী কলকাঠি নেড়েছে ওরা? ফলতার ওই পার্টির টপ ম্যানেজমেন্টের একজনকে হাত করে ওরা বলেছে যে, নামকরা কোনও ইউনির্ভাসিটি থেকে ভেটিং করাতে হবে আমাদের ডিজাইন। তারপর নাকি আমাদের প্রাইস ওরা অ্যাকসেপ্ট করবে! বোঝো একবার, কত বড় শয়তান! ওদের টেকনিক্যাল বোর্ড আমাদের ডিটেল পাস করে দেওয়ার পর ওরা এখন এই ফ্যাকড়া তুলেছে। ওই মেহতা ব্যাটা আমাদের এভাবে আউট করে দিতে চাইছে!"

ফোনে স্পষ্ট গুপ্তসাহেবের শ্বাসের শব্দ শুনলাম। লোকটা খুব খেপে গিয়েছে। কিন্তু বুঝলাম না, তাতে অসুবিধেটা কোথায়! বললাম, "স্যার, তো ভেটিং করিয়ে নিলেই হবে। প্রবলেম কী?"

"আরে, এ ছেলেটা তো আচ্ছা বোকা!" গুপ্তসাহেব বিরক্ত হলেন, "প্রাইস সাবমিশনে দু'সপ্তাহ আছে। সেখানে ভেটিং করাতেই তো মাসখানেকের মতো লেগে যাবে। পারব প্রাইস জমা দিতে?"

"কিন্তু স্যার, কাজ তো বেশি সময়ের নয়। যাঁরা ডিজাইন চেক করবেন, তাঁরা ইচ্ছে করলেই তো চার-পাঁচদিনে করে দিতে পারেন। না?"

"না রে খোকা, না, এটা ভারত। আমি কথা বলে দেখেছি। কোনও উপায় নেই। ওরা জেনারেলি যা সময় নেয়, সেটাই নেবে। আমাদের জন্য কোনও সুবিধে করবে না। শালা, কী যে করি!"

গুপ্তসাহেব যে ভুল বকছেন, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললাম, "স্যার ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"সব ঠিক হয়ে যাবে? তুমি জ্যোতিষ চ্যানেলের ডায়ালগ দিচ্ছ? আমি

কিছু জানি না। তুমি আজই যাবে ইউনিভার্সিটির সিভিল ডিপার্টমেন্টে। কথা বলবে। বেগ, বরো, ব্রাইব, আমি জানি না। ভেটিং সাতদিনের মধ্যে হওয়া চাই, বুঝেছ?"

"আরে!" আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

"মানে?" গুপ্তসাহেব এমন গলার জোর শরীরের কোথায় যে গোপন করে রাখেন কে জানে, "আরে মানে কী? আমি তোমার ইয়ারদোস্ত না প্রেমিকা যে, আমায় 'আরে' বলছ? আমি কিচ্ছু জানি না। আই ওয়ান্ট ইট ডান, ব্যস। অফিসে এসে পেপার নিয়ে সিভিলের অসীম গুহর সঙ্গে তুমি আজই যাবে। অ্যান্ড গেট ইয়োর অ্যাস হিয়ার কুইকলি।"

আমি কিছু বলার আগেই ফোনটা কেটে গেল। লে হালুয়া! আমি ফোনের দিকে তাকালাম। বাঁশের যে এমন চেন রি-অ্যাকশন কর্পোরেট দুনিয়ায় চলে সেটা আমি জানতাম। কিন্তু এমন ইললজিকাল বাঁশ যে কেউ খেতে পারে, আমার জানা ছিল না। যেখানে ইউনিভার্সিটি থেকে সময় বলে দিয়েছে, সেখানে আমি কোন খেতের মুলো রে ভাই?

"এনি প্রবলেম?" আমি এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই বুঝতে পারিনি কখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে অণু। এখন শীতকাল বলে একটা পুলওভার আর প্যান্ট পরে রয়েছে। চুলগুলো এলোমেলো করে বেঁধে রাখা আছে আর তাতে একটা পেনসিলের মতো কী যেন গোঁজা। ওর হাতে দুটো প্লেট।

আমি হাসলাম। অণুকে কিছু বলার নেই, "না, ওই অফিশিয়াল। হাতে কী?"

"ফ্রেঞ্চ টোস্ট। কাল রাতে খেতে বসে বলেছিলে না যে, তোমার ভাল লাগে। তাই আমি বানালাম তোমার জন্য। আর এটা তোমার বন্ধুর জন্যও।"

"বন্ধুর জন্য?" আমি বললাম, "বন্ধুকে খাওয়ানোর কথা তো নেই। এর জন্য আমায় কত বেশি টাকা দিতে হবে এ মাসে?"

"হাজার পাঁচেক দিয়ে দিয়ো একস্ট্রা!" অণু হাসল।

"পাঁচ হাজার? চার পিস ফ্রেঞ্চ টোস্টের জন্য?" আমি পটাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, "দ্যাখ মোটা, তোর জন্য কত গাঁটগচ্চা যাবে। তা পাঁচ হাজার কেন?"

অণু যেতে যেতে হেসে বলল, "এই শেফ যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়! তার একটা অ্যাডেড ভ্যালু নেই? এ কি যার-তার হাতের টোস্ট নাকি?"

অণু চলে যাওয়ার পর পটাই প্লেটটা হাতে নিয়ে একবার দরজার দিকে তাকাল, তারপর আমার দিকে তাকাল, "এ যে শালা পুরো রুম সার্ভিস বানিয়ে নিয়েছিস। ঘরে নাকি খাওয়ার পারমিশন নেই? তবে? মেয়েটা সত্যি খুব ভাল। প্রথমদিনের ইমপ্রেশন দেখে তোকে আমি যে-সাবধানবাণী দিয়েছিলাম, আজ উইথড্র করছি।"

আমি কিছু না বলে টোস্টে কামড় বসালাম। অণু যে ভাল, জানি। না হলে সেই রাতে আমি যখন বোকার মতো কাঁদছিলাম, ওই তো এসে আমায় সামলেছিল। বিছানায় বসিয়েছিল। জল এনে দিয়েছিল। কিন্তু কিচ্ছু জানতে চায়নি। এমনকী পরের দিন, যখন আমি অস্বস্তিতে ওর দিকে তাকাতে পারছিলাম না, তখন ও বরং ব্যাপারটাকে সহজ করে নিয়েছিল অন্য কথা বলে। একবারের জন্যও আমায় বিপাকে ফেলতে কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেনি। তবে হ্যাঁ, সেদিন বাইকে চড়ে ওই মিকিকে নিয়ে একটা প্রশ্ন করেছিল বটে। তবে আমি পাত্তা দিইনি। উত্তরও দিইনি। আর আমায় চুপচাপ দেখে ও নিজেও কথা বাড়ায়নি। আসলে আমি জানি, কেন এই প্রশ্ন ও করেছিল। মিকি সেই যে ফোন করেছিল জিনিস ফেরত নেওয়ার জন্য সেজন্যই বোধহয় কৌতূহল হয়েছিল ওর। তবে আমি এখনও সেই জিনিস ফেরত নিতে যেতে পারিনি। ইচ্ছেই নেই যাওয়ার।

"শালা, এ তো দারুণ করেছে!" পটাই নিজের প্লেটটা শেষ করে আমার প্লেট থেকে একটা টোস্ট তুলে নিয়ে বলল।

"টোস্টের আবার দারুণ কী আছে?"

"আছে। মন থাকলে বুঝতি। খেতে শুধু জিভ লাগে না রে মাল, মনটাও লাগে। সেটাকে ডিপ্লয় কর। বুঝেছিস?" পটাই আমার দিকে দুয়ো দিচ্ছে এমন করে তাকাল, "তা মেয়েটার সঙ্গে এদের রিলেটিভিটিটা কী বল তো?"

খাওয়া শেষ করে প্লেটটা টেবিলের উপর রেখে বললাম, "কাকুর বন্ধুর মেয়ে। এখানে থাকে, আসল বাড়ি শিলিগুড়ি।"

"ও। তা বেশ সুন্দর দেখতে কিন্তু। অনেকটা জুলিয়ে বিনোশের মতো, না? শুধু চোখ দুটো যা বড়।"

আমি কোনও কথা না বলে বাথরুমের দিকে এগোলাম। হাত ধুতে হবে, শেভও করতে হবে। অফিসে যেতে হবে যে!

পটাই আবার বলল, "তা নাম কী রে ওর? মানে, অণু তো ডাকনাম। পুরো নাম কী?"

আমি বাথরুমে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সত্যিই তো! ডাকনাম। ওর পুরো নাম কী? এতবার ওর সঙ্গে গিয়েছি, এসেছি। কোনওদিন তো জিজ্ঞেস করিনি। কেন করিনি? আমার মুখটা আবার কেমন যেন তেতো হয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে পটাইকে দেখতে গিয়ে বাইরে চোখ গেল। আরে, কুয়াশা কেটে গিয়েছে!

পটাই আমার চোখ অনুসরণ করে বাইরের দিকে তাকাল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কুয়াশা সত্যি কি কাটল লাল?"

আট

শীতের হাওয়া বুড়ো হয়ে গিয়েছে। তার দাঁতে আর জোর নেই। দিনও আগের চেয়ে বড় হয়েছে অনেক। আলো থাকছে একটু বেশি সময় ধরে। কলেজ স্কোয়্যারের জলে কয়েকটা রাজহাঁস আপনমনে ভেসে বেড়াচ্ছে! হাঁসগুলো দেখে আমার মনটা ভাল হয়ে গেল। কেন কে

জানে, সেই দমচাপা কষ্টটা আমি আজকাল আর বিশেষ টের পাই না। বরং, গত দু'-তিনদিন ধরে একটু হালকাই লাগছে। মনে হচ্ছে, মিকির না থাকায় যেন কোথাও একটা ভালই হয়েছে। মনে হচ্ছে, ও ঠিক যেন আমার জন্য ছিল না। এই যে আমি কম খেতাম, এক্সারসাইজ় করতাম, মাঝে মাঝেই আয়নায় নিজেকে দেখতাম যে, বয়স্ক লাগছে না তো... সেসব আর নেই। এখন আমি সাঁটিয়ে চিকেন চাঁপ খেতে পারি, বিরিয়ানি খেয়ে মনে হয় না ইস, তেলটা কী বেশি! এখন বেশি রাত করে ঘুমোলে সকালে চোখে ডার্ক সার্কল হবে, সে চিন্তাও থাকে না। ছুটির দিন দাড়ি না কামিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিই। এগুলো তো ভাল দিক। কারণ, মিকির সঙ্গে থাকার সময় সবসময় মনে হত যে, আমায় কি বয়স্ক দেখাচ্ছে? আমার সঙ্গে ওকে দেখলে কি লোকে আমাকে কাকু ভাববে ওর? জানি, তিরিশটা কোনও বয়স নয়। বিদেশি একটা লাইফস্টাইল ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম, থার্টি ইজ দ্য নিউ টোয়েন্টি। তবে যদি প্রেমিকার বয়স তোমার চেয়ে অনেকটা কম হয়, তা হলে ফেলে রাখা পাউরুটির গায়ে ফাঙ্গাসের মতো অনিবার্যভাবে তোমার মনেও কমপ্লেক্স এসে জমবে! এখন আমার বেশ কেমন যেন, হলেও হয়, না হলেও হয় টাইপের একটা মন হয়েছে। মানে, সন্ন্যাসী হলেও মন্দ হয় না, আবার একসঙ্গে দুটো মেয়ের সঙ্গে শুলেও মন্দ হয় না টাইপ! মানে, ধর্ম আর জিরাফ, আমি দুটোতেই আছি। ভাঙা প্রেম বেশ এডিটরের কাজ করে। জীবনটাকে এডিট করে মুদ্রণযোগ্য শব্দসংখ্যায় নিয়ে আসে। মানে, যা বেশ পড়ে ফেলা যায়, আবার বেশি স্পেসও খায় না।

মোবাইলটা বের করে ঘড়ি দেখলাম। জোড়াসাঁকো থেকে এখানে আসতে এত সময় লাগে? কী জানি কীসে আসছে? আর মেয়েটার ফোনেও নাকি চার্জ নেই। থাকলে নাহয় ফোন করে জেনে নিতাম কত দূর এসেছে। যদিও জানে যে, পাঁচটার সময় আমি দাঁড়িয়ে থাকব এখানে। সামনে একটা চানা-ছোলাওয়ালা বসেছে। খিদে নেই, তবু মনটা কেমন যেন খাই খাই করছে। এটা পেটের খিদে নয়, চোখের

খিদে! মিকি বলত, এমন সময় খেলেই ফ্যাট বাড়ে, ভুঁড়ি হয়। আর ভুঁড়িওয়ালা ছেলেরা নাকি জঘন্য হয়! কেন? না, নুড অবস্থায় নাকি তাদের জঘন্য লাগে। নুড? হাতিই নেই, আবার হাতির দাঁত! আমি পাঁচ টাকার চানামাখা কিনলাম। তেঁতুলের টক দিয়ে জমিয়ে মাখিয়েছি। হোক শালা ভুঁড়ি। কার বাপের কী?

শ্রী আজ বেশ জম্পেশ করে খাইয়েছে আমায়। কলেজ স্ট্রিটের একটা রেস্তরাঁয় আমার অনুরোধে শ্রী দেখা করতে এসেছিল। আসলে ও কিছু বই কিনতে এসেছিল, সেই সুযোগে আমিই দেখা করেছি ওর সঙ্গে। প্রায় সাড়ে তিনটের সময় কলেজ স্ট্রিট মোড়ের কাছে একটা রেস্তরাঁয় গিয়েছিলাম আমি। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটু সময় লেগেছিল শ্রীকে খুঁজে বের করতে। আমায় দেখতে পেয়ে শ্রী হাত তুলে আমায় ডেকে নিয়েছিল।

আমি ওর সামনে বসে হেলমেটটা রেখে সরাসরি বলেছিলাম, "মাইরি, তোমরা কী শুরু করেছ বলো তো?"

"কেন?" শ্রী-র মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল নিমেষে।

"কেন মানে? হঠাৎ দাদার উপর রাগ করে চলে গেলে! তারপর একদম রাজস্থান, দিল্লি, সিমলা... এটা কি ভারতদর্শন না দাদাকে টাইট দেওয়া?"

"তা কেন?" শ্রী মেনুকার্ড দেখতে দেখতে প্রশ্ন করেছিল।

"তুমি দাদাকে চেনো না? সে তো না খেয়ে দাড়ি রেখে জীবন্ত কাকতাড়ুয়া হয়ে গিয়েছে। তার উপর বাবাও খুব ঝাড় দিচ্ছে। তুমি ফিরে যাও বাড়িতে।"

"তুমি কি বাড়ি ফিরবে?" শ্রী পালটা প্রশ্ন করেছিল আমায়।

"মানে? এর মধ্যে আবার আমি আসি কোত্থেকে?" আমি অবাক হয়েছিলাম।

ওয়েটারকে ডেকে অর্ডার দিয়ে শ্রী আবার মনোযোগ দিয়েছিল আমার দিকে, "কেউ আসে না লাল। সবাই যার যার জায়গায় থাকে।

তোমার খারাপ লাগা থেকে তুমি চলে গিয়েছ আর আমার খারাপলাগা থেকে চলে গেলেই সেটা দোষ? আমি মেয়ে বলে?"

আমি মাথা নাড়লাম। এই হোমমেড নারীবাদী ব্যাপারটা আমার ভাল লাগে না। জানি, কথাটা সেক্সিস্ট শোনাচ্ছে, কিন্তু সবকিছুর ভিতর নারী-পুরুষের কূটকচাল এনে ঘোলা জলকে আরও ঘোলা করে দেওয়ার কোনও মানে আমি খুঁজে পাই না।

গ্লাস থেকে একটু জল খেয়ে বলেছিলাম, "শ্রী, তুমি জানো, দাদা অমন নয়। আমিও কি অমন? এর ভিতর ছেলেমেয়ে এনে ফেললে তো আর কথাই থাকে না।"

শ্রী মুখ ভার করে অন্যদিকে তাকিয়েছিল।

"দাদা আমার কাছে এসেছিল একদিন। আর প্রায় রোজ ফোন করে। তোমাকেও নাকি ফোন করে, কিন্তু তুমি নাকি ফোন রিসিভ করো না! কে একটা মেয়ে দাদার হাত ধরে হাঁটল আর তার জন্য এতদিন ধরে এভাবে দূরে সরে থাকবে? এটা কোনও কথা হল? তোমায় তো র‍্যাশনাল বলেই জানতাম। এমন করে তুমি যদি ভাবো, তা হলে তো কোনও সমস্যাই মিটবে না!"

"আমায় কি তোমার কচি খুকি মনে হয়?" শ্রী-র গলা ধারালো হয়ে গিয়েছিল, "তোমার দাদা তোমায় কী বলল আর তার ভিত্তিতে তুমি আমায় এমন বলছ!"

"তুমি দাদার হাত ধরে একটা মেয়ে হাঁটছে দেখে রাগ করে চলে আসোনি?"

"না, লাল, তা আসিনি। ব্যাপারটা একদম ঠিক নয়।"

"অ্যাঁ?" অবাক হয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও চুপ করে গিয়েছিলাম। ওয়েটার এসে খাবার নামিয়েছিল টেবিলে।

শ্রী থমথমে মুখে খাবার পরিবেশন করে একটা মাংসের টুকরো তুলে বলেছিল, "তুমি কি জানো, কী হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি?"

মাথা নেড়ে বলেছিলাম, "কী হয়েছিল শ্রী?"

"তোমার দাদার যে আজকাল মাঝে মাঝে মদ খাওয়ার গুণ হয়েছে, তা কি তুমি জানো?"

"দাদা? মদ?" আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল! এ যেন দক্ষিণ মেরুতে পোলার বেয়ার পাওয়া গিয়েছের মতো ব্যাপার!

"হ্যাঁ লাল। তোমার দাদা আজকাল মাঝে মাঝে মদ খেয়ে আসে। সেদিন ওই মেয়েটির সঙ্গেও সে মদ খেয়ে এসেছিল। আমি মেয়েটাকে নিয়ে একটু ইয়ারকি করেছিলাম। আর তাতে তোমার দাদা আচমকা আমায় বাপ-মা তুলে গালাগালি দিয়েছিল! বাঁজা বলে ধাক্কা মেরে বিছানায় ফেলে দিয়েছিল। এসব কি তুমি জানো? আমার সন্তান নেই। তাতে কি আমার দোষ? আমার ইচ্ছে করে না যাতে আমার ছোট্ট কেউ থাকুক? এসবে কি কারও হাত থাকে? সেখানে তোমার দাদা আমায় বাঁজা বলল? এমন ভাষা কোনও ভদ্রলোক মুখে আনে? আর তারপর ধাক্কা মারবে? মেরে ফেলে দেবে? আমি কি মানুষ নই?"

আমি মাথা নিচু করে নেওয়ার আগে দেখেছিলাম, শ্রী ঠোঁট টিপে কান্নাটা সংযত করছে! তবু কান্না হল সেই সব দুষ্টু ছেলেদের মতো, যাদের পাঁচিল দিয়ে আটকে রাখা যায় না। তারা ঠিক পাঁচিল টপকে বেরিয়ে আসে বাইরে। শ্রী-র চোখের জলও সব বাধা টপকে লাফ দিয়ে নেমেছিল গালে। আমি আর কথা বলতে পারছিলাম না। আমার দাদা এমন? ও এমন করেছে? এ যে আমি চিন্তাও করতে পারি না! আর সেখানে দাদা আমার কাছে ভালমানুষের মতো মুখ করে এসেছিল!

তারপর অনেকক্ষণ কথা বলিনি। শুধু খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলাম।

শ্রী বলেছিল, "খেয়ে নাও লাল। আমি জানতাম, তুমি এসব জানো না। শোনো, তোমার দাদা তোমার কাছে একরকম। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, সে ধোওয়া তুলসীপাতা। তোমার দাদা তো আর তোমায় এসব গুণের কথা বলবে না। আর কোন মেয়ে হাত ধরল কি পা ধরল,

সে সবে নেতিয়ে পড়ার মেয়ে আমি নই। যাক গে, খেয়ে নাও," শ্রী নিজেও খেতে শুরু করেছিল।

আমার ইচ্ছে করছিল না খেতে, কিন্তু শ্রী বলেছিল, "খাবার নষ্ট কোরো না। সবার তো চেঞ্জ হয়, তোমার দাদারও হয়েছে। শুধু আমার সেটা ভাল লাগছে না। কেউ আমার অসম্মান করবে আর আমি পড়ে পড়ে মার খাব, এমন মেয়ে আমি নই। তা ছাড়া হরিৎ ভয় পাচ্ছিল যে, বাবা জানতে পারলে ওকে বকবে। কিন্তু বাবাকে আমি কিচ্ছু বলব না। কারণ, বাবা সব জানলে ওকে বের করে দেবে বাড়ি থেকে।"

"দাদা এমন করেছে, এটা আমি ভাবতেই পারছি না!" আমার একটা অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছিল। আসলে মানুষের সারা জীবনের বিশ্বাস, সে যত সামান্যই হোক না কেন, যখন ভেঙে যায় তার যন্ত্রণাটা কিন্তু সামান্য থাকে না। আসলে আমাদের বিশ্বাসগুলো আমাদের বন্ধুত্বের মতো। এক-একটার ভেঙে যাওয়া মানে আমাদের আরও একা হয়ে যাওয়া।

"আমারও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কিন্তু কী করব? এটাই হয়তো জীবন।"

আমি খেতে শুরু করেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। দাদা মনে হয় অনুতপ্ত। রিগ্রেট করছে এখন। সবাই তো একটা চান্স পেতেই পারে। পৃথিবীতে আমরা যাদের পছন্দ করি, তাদের দোষ আমরাই তো ক্ষমা করে দেব, না?"

"আয়্যাম নট আ সেন্ট লাল। আমি জানি না, কী করব। এসএসসি দেব বলে এখানে এসেছিলাম বইপত্র কিনতে। দেখি, আমার জীবন এখান থেকে কোথায় যায়!" শ্রী-র ফরসা মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছিল একদম।

"তোমার বাড়ির রিঅ্যাকশন কী? তারা কি সব ডিটেল জানে?"

"বাবা-মা তো জানোই কেমন চুপচাপ। তারা যথেষ্ট আপসেট। কিন্তু আমার উপর জোর করে চাপিয়ে কিছু দিতে চায় না। আর আমিও তো ডিটেলে বলিনি কিছু। শুধু জানে, হরিতের সঙ্গে আমার কিছু একটা

হয়েছে। তবে জেঠুমণি খুব খেপে আছে হরিতের উপর। একবার সামনে পেলে একদম খেয়ে ফেলবে।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। শ্রী-র জেঠুমণিকে আমি দেখেছি। ভাল আলাপও আছে। নাম বরেন চ্যাটার্জি। আমি বলি, বুরুজেঠু। ভদ্রলোক একটা বড় কনসালটেন্সি ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ভীষণ রাগী, অকৃতদার এবং শ্রী-অন্ত প্রাণ।

খাওয়া শেষ করে আমরা নীচে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। শ্রীকে বুরুজেঠু পিক-আপ করে নেবেন। আমরা নীচে আসার দু'মিনিটের ভিতর জেঠু এসে পড়েছিলেন। অন্য সময় হলে হয়তো আমার সঙ্গে কথা বলতেন। কিন্তু আজ যেন দেখতেই পাননি এমন মুখ করে বিশাল বড় গাড়িটার পিছনে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিলেন।

শ্রী গাড়িতে উঠে বলেছিল, "জেঠুমণি, দেখো লাল এসেছে।"

জেঠুমণি অন্যদিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, "তাতে কী হয়েছে? আমায় নাচতে হবে?"

"এটা কিন্তু ঠিক নয়," শ্রী হেসে ব্যাপারটা হালকা করার চেষ্টা করেছিল, "ও কী দোষ করল?"

জেঠুমণি বলেছিলেন, "দোষ অবশ্যই করেছে। এমন দাদাকে ধরে পেটাতে পারেনি?"

শ্রী বলেছিল, "তুমি না একদম বাচ্চাদের মতো কথা বলছ! আর তুমি জানো হরিৎ কী করেছে?"

জেঠুমণি গলার স্বর একইরকম রেখে বলেছিলেন, "তুই কি বলেছিস কী করেছে? কিন্তু আমি জানি, খুব খারাপ কিছুই করেছে। দাঁড়া না, একবার বাগে পাই শয়তানটাকে।"

আমি বলেছিলাম, "জেঠুমণি, আমি দাদাকে উচিত শিক্ষা দেব। আপনি দেখবেন।"

জেঠুমণি এবার মুখ ফিরিয়ে আমায় দেখে বলেছিলেন, "আমি নিজের কাজ অন্যের ঘাড়ে চাপাই না। তবে দেখা যাবে।"

কী আর দেখব? জেঠুমণিও বা কী দেখবেন? এখানে কি কোনও সিনেমা হচ্ছে নাকি? আমি তো জাস্ট কথার কথা বলেছিলাম। দাদাকে কী করব আমি? কাকেই বা কী করব? এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চানামাখা খাওয়া ছাড়া আর কী করার থাকতে পারে আমার? আর মেয়েটা কই? জোড়াসাঁকো কি জালালাবাদের কাছে চলে গিয়েছে যে, আসতে এত সময় লাগে? এই জন্য আমি আসতে চাইনি।

"হাই," বুনোফুলের গন্ধের সঙ্গে নদীর গুঞ্জনও ভেসে এল হঠাৎ।

"তুমি এলে তবে?" আমি মুখে একটা বিরক্তি ফুটিয়ে তুললাম।

"সরি, আসলে তোমায় তো বলেছি যে, আমি কলেজ স্ট্রিট খুব একটা চিনি না। ওই সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ থেকে হেঁটে এতটা আসতে গিয়ে একটু গুলিয়ে ফেলেছিলাম। আর মোবাইলটাতে চার্জ নেই যে, তোমায় জানাব!" অণু হাসল।

ওর গালের দুটো লম্বা টোল আর বাদামি চোখ দেখে কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল আমার। বেশ সুন্দর তো অণু! মানে, ভালই সুন্দর। মানে যথেষ্টই আর কী। আমার গলার কাছটা শুকিয়ে এল হঠাৎ। জানি তো, এমনই হবে। চানা খেলে গলা শুকোবে না?

"তুমি আমাকে ছাড়াই খাচ্ছ?" অণু আমার প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া চানার ঠোঙা ধরে টান মারল, "এ বাবা! সব শেষ করে ফেলেছ যে! আর তুমি কি ঘোড়া নাকি যে, ছোলা চিবাচ্ছ?"

ভাবলাম, ঘোড়া কেন, আমার তো মাঝে মাঝে নিজেকে গাধা মনে হয়। কিন্তু সব মনে হওয়াগুলো তো বলতে নেই। তাই গম্ভীর মুখ করে তাকিয়ে রইলাম।

"আমার তেষ্টা পেয়েছে," অণু বাচ্চাদের মতো করে হাত-পা দাপাল।

আমি গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললাম, "মিনারেল ওয়াটার খাবে?"

মুখটা বেজার করে আমার দিকে তাকাল অণু, "এতটা আনরোম্যান্টিক কেন তুমি? শুনেছি, এখানে একটা ভাল শরবতের দোকান আছে?"

আনরোম্যান্টিক? রোম্যান্স কোথায় যে, আনরোম্যান্টিক হব? আমি ভাল করে অণুর দিকে তাকালাম। সেই গভীর দুটো টোল আর বাদামি চোখ। রাগ করে ঠোঁট টিপলেও ওর টোল পড়ে? নাঃ, এত চানা খাওয়া ঠিক হয়নি আমার! গলাটা... বললাম, "চলো, সামনেই সেই দোকানটা আছে।"

"তাই?" অণু হাসল, "গ্রেট! শীতকালেই আমার ঠান্ডা খেতে বেশি ভাল লাগে।"

শরবতের দোকানটা অনেক পুরনো। সিঁড়ি দিয়ে দু'-চার ধাপ উঠে লম্বাটে মতো। সার দিয়ে চেয়ার টেবিল পাতা। দেওয়ালে হরিণের শিংওয়ালা মাথা আটকানো। আর কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের ছবিও টাঙানো। আমরা একটা ফাঁকা টেবিলে মুখোমুখি বসলাম।

অণু বলল, "দেখো, মাথার উপর কড়ি-বরগা আছে। কতদিনের পুরনো, না?"

আমি মাথা নাড়লাম শুধু। এখানে আমি কী করছি? এখানের কাজ সেরে আমি আর অফিস গেলাম না কেন? কেন অণুর কথায় এখানে এসেছি? ও কলকাতার এই অঞ্চলটা চেনে না তো আমার কী? আমি কি গাইড? সরকার থেকে কি আমাকে 'অতিথি দেব ভব'র ক্যাম্পেনিং-এর জন্য পাঠানো হয়েছে?

"তুমি সেই মোহনের দোকান থেকে জিনিসগুলো নিয়ে এসেছ?" অণু হঠাৎ প্রশ্নটা করল।

"মোহনের দোকান?" অবাক হলাম একটু।

"সেই যে তোমার প্রেমিকা তোমার জিনিসগুলো ফেরত দিয়ে রেখে গিয়েছিল যে-দোকানে? সেটা তো এই কলেজ স্ট্রিটেই, না?" অণু সরাসরি তাকাল আমার দিকে।

"প্রে-মি-কা?" আমি ঢোঁক গিললাম।

"হ্যাঁ। কেন? তোমার সঙ্গে তো তার ব্রেকআপ হয়ে গিয়েছে, তাই না? সেই বাচ্চা মতো মেয়েটা? মলের সামনে... সেই তো তোমার প্রেমিকা? তাই না? তারপর তার জন্য কাঁদলে। মনে আছে?"

কোনওমতে বললাম, "তুমি? মানে..."

"আমায় তুমি কিছু বলোনি, কিন্তু আমায় কি এতটা মূর্খ মনে হয় তোমার?"

আমায় বাঁচিয়ে দিল ওয়েটারটা। শরবতের অর্ডার দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, "তুমি ঠিক বলেছ। মিকির সঙ্গে আমার ভাব ছিল।"

অণু স্থির চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর আলতো স্বরে জিজ্ঞেস করল, "আর এখন?"

এখন? আমি আমার শুকনো ফাটামাটির মতো গলা থেকে উত্তর বের করার আগেই পিকপিক করে ফোনবাবাজি বেজে উঠল। দেখলাম, অফিসের অসীমদা।

"লাল," অসীমদার গলা শুনে বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে, "গুপ্তসাহেব আমায় মেরে ফেলবেন!"

আমি কোনও কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে কাজ করি না আন্ডারওয়র্ল্ডে কাজ করি, মাঝে মাঝে বুঝি না। মেরে ফেলা ছাড়া আর কি কোনও কথা মাথায় আসে না এদের? বললাম, "কেন অসীমদা, কী হল?"

অসীমদা হাউমাউ করে বলল, "আরে, আমি ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম। পেপার তো সব ভেটিং-এর জন্য জমা করাই ছিল। আজ ভেবেছিলাম, রিকোয়েস্ট করব ওদের হেডকে। কিন্তু শুনলাম, তিনি ছুটিতে আছেন। পরশুদিন ফিরবেন।"

বুঝলাম, ব্যাপারটা খুবই সমস্যার। কিন্তু কেউ ছুটিতে থাকলে অসীমদা আর কী করবে? বললাম, "আপনি গুপ্তসাহেবকে বলবেন। এতে প্রবলেম কী আছে?"

"পোদ্দারসাহেব নাকি ব্যাপক রেগে আছেন। মেহতারা কীভাবে আমাদের আগে ফলতায় ওই কোম্পানিতে সেটিং করে রাখল, সেটা নিয়ে গুপ্তসাহেবকে ব্যাপক ঝেড়েছেন। পোদ্দারসাহেব বেঁটে মানুষ, কিন্তু রেগে এমন হয়ে আছেন, ওঁকে এখন নাকি লম্বা লাগে!" অসীমদা হাঁসফাঁস করে বলল।

"ঠিক আছে, আমি দেখছি। আপনি টেনশন করবেন না। ইউনির্ভাসিটিতে আমিই না হয় যাব।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, বাই। আমায় বাঁচালে। বাড়িতে বউ, অফিসে গুপ্তসাহেব, আমি যাব কোথায় বলো তো?" অসীমদা নতুন শহরে রোড ম্যাপ হারানো মানুষের মতো গলায় কথা বলল।

"টেনশন করবেন না, বললাম তো। এখন রাখছি," বিরক্তগলায় রেখে দিলাম ফোনটা।

"কোন ইউনিভার্সিটি?" ফোনটা রাখামাত্র অণু জিজ্ঞেস করল।

"তোমাদের," আমি সামনে রেখে যাওয়া শরবতের গ্লাসে চুমুক দিলাম।

"কেসটা কী বলো তো? দু'-তিনদিন আগেও ফোনে এই নিয়ে একটা কথা হচ্ছিল শুনেছিলাম।"

"তুমি অন্যের কথা আড়ি পেতে শোনো বুঝি?"

"না, অন্যের কথা শুনি না। তোমার কথা শুনছিলাম। ঘরে তোমার বন্ধুও ছিল। নাও কাট দ্য ক্র্যাপ। আমায় বলতে পারো। আমি তো কোনও হেল্‌পও করতে পারি!"

আমি মাথার উপর ওই কড়ি-বরগার দিকে তাকালাম। কাটাকুটি করে কীভাবে ধরে রেখেছে ছাদটাকে! আমাদের জীবনেও যদি এমন একটা কিছু থাকত? যদি ধরে রাখত এমন করে আমাদের?

সময় নিয়ে অফিসের সমস্যাটা বললাম অণুকে। ফলতার কাজ থেকে মেহতার ব্যাগড়া থেকে ইউনির্ভাসিটির ভেটিং, সব বললাম।

অণু শুনে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "সিভিল ডিপার্টমেন্ট! হুম। আচ্ছা, বললে না তো এখন তোমার সঙ্গে ওই মিকি বলে মেয়েটার সম্পর্ক আছে কিনা?"

"মানে?" আমি অবাক হলাম।

"মানে, আর ইউ স্টিল ইন লাভ উইথ দ্যাট গার্ল?"

"এর সঙ্গে অফিসের ব্যাপারটার সম্পর্ক কী?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস

করলাম।

শরবতে চুমুক দিয়ে আবার টোল ফেলে হাসল অণু, "এভরিথিং ইজ কানেক্টেড ডিয়ার। দ্য হোল ইউনিভার্স ইজ কানেক্টেড টু ইচ আদার। বুঝলে?"

আমি শরবতের গ্লাসের দিকে তাকালাম। শরবত খেলে তো গলা ভেজে। সেখানে আমার গলাটা আরও শুকিয়ে গেল কী করে?

নয়

"প্যারিস যাবে, প্যারিস?" গুপ্তসাহেব এমন করে কথাটা বললেন, যেন লক্ষ্মীকান্তপুর যাওয়ার কথা বলছেন!

"প্যারিস?" আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। হঠাৎ এমন প্রস্তাব কেন?

গুপ্তসাহেব হাসলেন, "কী, একদম গোল খেয়ে গেলে যে! প্যারিস জানো না? যাকে পারি বলে। ফ্রান্সের রাজধানী। যাবে?"

কী বলব, বুঝতে পারলাম না। উনি ইয়ারকি করছেন, না সত্যি বলছেন, ভগবানই জানেন। প্যারিস যাব কেন আমি? বললাম, "স্যার, কী বলছেন, বুঝতে পারছি না। প্যারিস যাব কেন?"

গুপ্তসাহেব হেসে কফিতে চুমুক দিলেন। আজ একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। মানে, সকাল থেকে কয়েকটা ব্যাপারই ঘটেছে, তার মধ্যে একটা আর কী! আজ গুপ্তসাহেব এখনও পর্যন্ত একবারও মরে যাওয়ার বা মেরে ফেলার কথা বলেননি! বরং ব্যাপক মুডে আছেন। একা একা হাসছেনও। মানুষটা বুড়ো বয়সে প্রেমে পড়লেন নাকি? না হলে তো এমন হওয়ার কথা নয়।

গুপ্তসাহেব বললেন, "বেনিনের নাম শুনেছ?"

"কী নিন?" আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

"বেনিন? নিশ্চয়ই শোনোনি। এত পুয়োর তোমার জেনারেল নলেজ যে, কী আর বলব!"

ভাবলাম বলি যে, জেনারেল নলেজ তো জেনারেল মানুষদের জন্য, আমার জন্য নয়। কিন্তু বসের সঙ্গে কখনও চ্যাংড়ামো করতে নেই। ওভার স্মার্টনেস পাড়ার আড্ডায় দেখানো যায়, কিন্তু জীবনে যায় না। কারণ? খুব সোজা। জীবনটা পাড়ার আড্ডা নয়। বসের সামনে বরং একটু ছেলেমানুষ থাকতে হয়। আর বসের ছোটখাটো বকুনিগুলো খেয়ে তুমি যেন আহ্লাদিত হচ্ছ, তেমন একটা ভাব করতে হয়! এসব আমি চাকরি করি বলে জানি। তাই ফর্মুলা অনুযায়ী অ্যাক্টিং করতে অসুবিধে হল না। জেনারেল নলেজ নিয়ে গুপ্তসাহেবের সামান্য ধমকটা তাই টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন দিয়ে শুষে নিলাম।

গুপ্তসাহেব বললেন, "বেনিন হল ওয়েস্ট আফ্রিকার একটা দেশ। টোগো, বেনিন, সিয়েরালিয়ঁ। এবার বুঝেছ?"

এবার বুঝলাম! ওরে বাবা, পৃথিবীর যে ক'টা সাংঘাতিক জায়গা আছে, এগুলো তো তার মধ্যে অন্যতম! এখানে তো মারামারি লেগেই আছে। ড্রাগ, চাইল্ড সোলজার, ব্লাড ডায়মন্ড, এড্‌স, হোক্স ইমেল, ওয়ার লর্ড... এসবের কথা তো একসঙ্গে মনে আসে এই দেশগুলোর কথা শুনলে। সেখানে কী হল রে আবার? আর চাপতে পারলাম না। বলে ফেললাম, "স্যার, সে তো প্রায় হাফ যুদ্ধক্ষেত্র। সেখানে আবার কী হল?"

"কে বলেছে হাফ যুদ্ধক্ষেত্র? তুমি নিজে গিয়ে দেখেছ? হলিউড মুভিতে সবসময় বাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখানো হয়। আমি নিজে নাইজিরিয়ায় ছিলাম। অত ভয় পেলে হয় না। আমাদের প্যারিস অফিস থেকে সেখানে একটা বড় কাজের কথা হচ্ছে। পোদ্দারসাহেব বললেন তোমার কথা। তুমি যে সুন্দরভাবে ভেটিংটা করিয়ে আনলে এত দ্রুত, তার রিওয়ার্ড বলতে পারো। বুঝেছ?"

রিওয়ার্ড? বেনিনের মতো জায়গায় যাওয়া কি কোনও পুরস্কার হতে

পারে? এ যে সিংহের মুখে ঠেলে দেওয়া! ডার্ক কন্টিনেন্টে পাঠিয়ে আমার লাইফটাকে ডার্ক করে দেওয়ার ধান্দা! বললাম, "স্যার, কেন মারছেন?"

"আরে, বোকা ছেলে!" গুপ্তসাহেব হাসলেন, "তোমায় বেনিনে যেতে হবে না। তোমায় প্যারিসে বসে গেহার্ডদের কোম্পানির সঙ্গে টেকনিক্যাল লিয়াজঁ মেনটেন করতে হবে। প্যারিস থেকে তোমায় জার্মানি যেতে হবে। বুঝেছ? বেনিন তোমায় পাঠানো হচ্ছে না। এইজন্য বাঙালির কিছু হয় না। ভয়েই সব মরলে তোমরা।"

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, তা হলে তো কোনও প্রবলেম নেই।

গুপ্তসাহেব বললেন, "আমি নিজে এই ফলতার কাজটার প্রাইস জমা দিয়ে প্যারিস যাব। ওখানের অফিসে কিছু কাজ আছে। তারপর তোমার আপত্তি না থাকলে সামনের জুনে তোমায় প্যাক করে পাঠিয়ে দেব। কেমন?"

আমি তাও একটু সময় নিলাম। কেন নিলাম, কে জানে! মানে, আমার কাছে এখন কলকাতা যা, প্যারিসও যা, রেকেওয়েগও তাই! ফলে আমার আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু কীসের জন্য যে মনটা একবার নেচে উঠল না, সেটা ভেবেই একটু থামলাম!

গুপ্তসাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, "মনে হচ্ছে, চিন্তায় পড়ে গিয়েছ? আমাদের অফিসে তোমার র‍্যাঙ্কের যত জন আছে, সবাই কিন্তু এমন প্রস্তাব পেলে নেচে-কুঁদে একসা করত! আর সেখানে তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, যেন তোমায় বিশ্বনাথন আনন্দের সঙ্গে দাবা খেলতে বসানো হয়েছে! কী ভাবছ? প্রেমিকা কী বলবে? না বাড়িতে কী বলবে!"

প্রেম, আবার প্রেম! গুপ্তসাহেব কথায় কথায় কেন যে আমার প্রেমের কথা বলেন, ভগবানই জানে! লোকটার কি মনে হয় যে, আমার প্রেম করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই? আমার যে এখন প্রেমের নাম শুনলে পেটের ভিতরটা কেমন করে, তা কি উনি জানেন?

উনি কি জানেন যে, সম্প্রতি আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট একটা মেয়ে আমায় ল্যাং মেরে কুপোকাত করে দিয়েছে? না জেনে কেউ কথা বললে খুব মাথাগরম হয়ে যায়। আমার মনে হল, সামনে রাখা কফির কাপটা গুপ্তসাহেবের মাথায় উলটে দিই!

চোয়াল শক্ত করে মেঝেতে পাতা বাদামি কার্পেটের দিকে তাকালাম। ঘরের কাচের দরজাটা বন্ধ। মাথার উপর এসি-তে বাইশ ডিগ্রি তাপমাত্রা পৌষের ঠান্ডাটা বুঝতে দিচ্ছে না।

গুপ্তসাহেব কী বুঝলেন, কে জানে। হঠাৎ নিজের সিট থেকে উঠে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "কী হল লালমোহনবাবু? আমি কি কোনও দুর্বল জায়গায় হাত দিয়ে ফেললাম?"

আমি সেই বহু ব্যবহৃত কাঠের হাসিটা বের করতে চেয়েও ব্যর্থ হলাম। নিচু গলায় বললাম, "না স্যার। কোনও প্রবলেম নেই। আসলে একটু বাড়ির লোকের সঙ্গে আলোচনা করে বললে কি হবে? না এখনই বলতে হবে?"

"আরে না, না। টেক ইয়োর টাইম। চিন্তা করে নাও। মনস্থির করে নাও। এখনও তো সময় আছে। বুঝেছ?"

"ঠিক আছে স্যার। আমি তবে আসি স্যার। লাঞ্চ করা হয়নি এখনও।"

"সে কী খাওনি? কেন? যাও, খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি," গুপ্তসাহেব আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন, তারপর হঠাৎ বললেন, "লাল, জীবনে হাঁটতে গিয়ে মানুষ পড়ে যায়, তা বলে কি সে আর হাঁটে না? না ভয়ে সারাজীবন বসে থাকে ঘরের ভিতর?"

আমি ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম, "মানে স্যার?"

গুপ্তসাহেব হাসলেন একটু। তারপর বললেন, "এত কম আই কিউ নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে কাজ করো? তুমি কি আমায় মারবে?"

গুপ্তসাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আমি নিজের কিউবিক্‌লের দিকে

এগোলাম। টিফিন আওয়ার্স বলে এখন অফিস একটু ফাঁকা। শুধু দুটো ড্রাফ্টসম্যান নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। আমার কিউবিক্‌লটা একটু একপাশে। অন্যদের চেয়ে চারআনা বেশি সাজানো। এটা আমি যে অন্যদের চেয়ে একটু উঁচু পদে আছি, সেটা বোঝায়। চেয়ারে বসে এদিক ওদিক দেখে ব্যাগের ভিতর থেকে বড় চ্যাপ্টা টিফিন বক্স বের করলাম। এদিক-ওদিক দেখার কোনও কারণই ছিল না। আমি টিফিনের সময় কী খাচ্ছি, তাতে অফিসের মাথাব্যথা থাকবে কেন? কিন্তু তবু কেন অস্বস্তি হচ্ছে, সেটাই বুঝতে পারছি না। আসলে সকাল থেকে যে ক'টা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে এই টিফিন বক্সটাও আছে!

অন্যদিনের মতো আমি ব্রেকফাস্ট সেরে নিজের ঘরে এসে ব্যাগ গোছাচ্ছিলাম। বাইকটা একটু গন্ডগোল করছে বলে দিনকয়েক বাসে যাতায়াত করছি। ফলে একটু আগে বেরোতে হচ্ছে। দরকারি একটা ফাইল খুলে নতুন একটা প্রোজেক্টের কয়েকটা ওয়াটার রিটেনিং স্ট্রাকচারের ডিজাইন শিটগুলো দেখে নিচ্ছিলাম, সব ঠিক আছে কিনা। হঠাৎ ঠকঠক করে দরজায় নক হয়েছিল। ঘুরে দেখেছিলাম যে, দরজা দিয়ে উঁকি মারছে অণু।

"আরে, তুমি?" একটু অবাক হয়েছিলাম। আসলে ব্রেকফাস্ট টেবিলে আজ মেয়েটা ছিল না। আমার জানতে ইচ্ছে করছিল কেন অণু নেই, কিন্তু কাকিমাকে আর জিজ্ঞেস করিনি। ওঁর যা কৌতূহল! একটা প্রশ্ন করলে উনি তার পরিবর্তে দশটা প্রশ্ন করে বসেন। আর সে এমন প্রশ্ন যে, ভবানী ভবন থেকে জানতে পারলে ওঁকে ভাড়া করে অপরাধীদের জেরা করার জন্য নিয়ে যাবে! কেন যে ভদ্রমহিলা এত প্রশ্ন করেন! কী হবে উনি যদি সব না জানেন? আজকাল মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে। তাই পারতপক্ষে ওঁর সঙ্গে মনোসিলেব্‌ল ছাড়া কথা বলি না। স্কুলের টু-ফলসের মতো যতটা সম্ভব ইয়েস-নো দিয়ে কাজ সারি। তাই আমি অণুর কথা জিজ্ঞেস করার রিস্‌ক নিইনি। ভেবেছিলাম, অণু হয়তো ইউনিভার্সিটি চলে গিয়েছে। তাই আমার ঘরের দরজা দিয়ে ওর

মাথাটা উঁকি দিচ্ছে দেখে অবাকই হয়েছিলাম।

অণু হেসে ঘরে ঢুকেছিল, "ভাবলাম, তুমি বেরিয়ে গিয়েছ।"

"না যাইনি, তবে যাব এবার। কিছু বলবে?"

অণু এতক্ষণ নিজের পিছনে লুকিয়ে রাখা ডান হাতটা বের করে এনে বলেছিল, "এটা তোমার জন্য এনেছিলাম।"

"আমার জন্য?" ঘাবড়ে গিয়েছিলাম একটু, "কেন? কী আছে এতে?"

"এমন করে জিজ্ঞেস করছ, যেন তুমি এর আগে এমন কিছু দ্যাখোনি। মাঝে মাঝে এমন ন্যাকামো করো না, ভাবি..." অণু মুখটা রাগী রাগী করে তাকিয়েছিল, "আরে বাবা, টিফিন বক্স এটা। আর এতে থাই স্টাইলে তৈরি এক ধরনের নুড্‌লস আছে। বুঝেছ?"

"নুড্‌লস?" আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, "তা আমি নিয়ে কী করব?"

"মাথায় মেখে বসে থাকবে!" অণু ঠক করে আমার টেবিলের উপর টিফিন বক্সটা রেখে দরজার দিকে যেতে যেতে গজগজ করেছিল, "সারা সকাল ধরে খাবার তৈরি করলাম, আর এখন বলে কিনা কী করবে? ন্যাকা না বোকা, কে জানে!"

আমি অনাবশ্যকভাবে আবার আশপাশটা দেখে নিলাম। আসলে কেন জানি না, আমার হাতটা কাঁপছে একটু। পেটের ভিতর চড়াই উড়ছে। গলাটা আবার শুকিয়ে আসছে। নিজেকে নিজেই ধমক দিলাম। মোটে একটা তো টিফিন বক্স। তাতে তা-ও খাবার আছে। এমন তো নয় যে, টিফিন বক্স খুললে বোমা ফাটবে! তবে? ওরে ভয় কী রে তোর ভীরু? খুলেই ফেললাম টিফিন বক্সটা। আঃ, দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে! এতক্ষণে টেনশনের তলায় চাপা পড়া খিদেটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠল। নুড্‌লসের উপরে উলটো করে রাখা ফর্কটা তুলে খেতে যাব, এমন সময় ডেস্কে রাখা মোবাইলটা পিকপিক করে উঠল। আঃ, আমার বিরক্ত লাগল একটু। কে রে বাবা? শান্তিতে খেতেও দেবে না? আমি

ফোনটা তুলে থমকে গেলাম। টেলিপ্যাথি নাকি রে বাবা?

অণু ফোনের ওপার থেকে বলল, "কেমন হয়েছে?"

গম্ভীর গলায় বললাম, "জানি না।"

"মানে?" অণুর গলায় রাগ, "কেন? জানো না কেন? না খেয়ে কি সত্যি মাথায় মেখেছ নাকি?"

আমি একইভাবে বললাম, "খেতে দিলে কই? সবে খেতে যাব তখনই ফোন করলে।"

অণু হাসল এবার। বেশ খিলখিল ধরনের হাসি। যেন ধরে কাতুকুতু দেওয়া হয়েছে! আমি হঠাৎ মনে মনে ওর ওই লম্বা টোলদুটো দেখতে পেলাম!

"হোল্ড করছি। খেয়ে বলো। আজই প্রথম করলাম।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "তা হাতের কাছে আমিই ছিলাম গিনিপিগ হিসেবে? অন্য কাউকে বধ করলে হত না?"

"বাজে কথা না বলে খেয়ে বলো তাড়াতাড়ি। আমার ক্লাস আছে। কাম অন, কুইক।"

আমি বাধ্য ছাত্রের মতো খেলাম। বা রে! বেশ করেছে তো! ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু দিব্যি ভাল হয়েছে খেতে। ইন ফ্যাক্ট, বেশ ভাল হয়েছে। এ মেয়ের তো অনেক গুণ!

"ভাল হয়েছে, খুবই ভাল হয়েছে!"

"সত্যি? না ঢপ?" অণুর গলায় সন্দেহ।

"ঢপ? কলেজের লেকচারার বলছে ঢপ? ছাত্রছাত্রীরা কী শিখবে?" আমি হাসলাম।

"এসব আমি স্টুডেন্টদের থেকে শিখেছি। বাদ দাও, শোনো না," অণুর গলাটা নরম হয়ে গেল হঠাৎ, "তোমার ভাল লেগেছে?"

আমি হাসলাম। তারপর হালকাভাবে বললাম, "ভাল তো লেগেছেই। কিন্তু এই ঘুষটা না দিলেও হত। আমি এমনিতেই তোমার ওই কাজটা করে দিতাম। তুমি আমার কাজ করে দিয়েছ, তার পরিবর্তে আমিও

করে দিতাম। বুঝেছ? কালই তো দেখা করার আছে ওর সঙ্গে।"

ফোনটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল নিমেষের জন্য। আমি দু'বার হ্যালো হ্যালো করলাম। কী হল রে বাবা, লাইন কেটে গেল নাকি?

হঠাৎ অণুর গলা পেলাম, "এটা ঘুষ? আমার কাজ করে দেওয়ার জন্য ঘুষ? কিচ্ছু করতে হবে না তোমাকে। কিচ্ছু করতে হবে না। জাস্ট ভুলে যাও আমি ওটা রান্না করেছি। বাই।"

অণু হঠাৎ ফোনটা কেটে দেওয়ায় আমি থতমত খেয়ে গেলাম। কী হল মেয়েটার? রাগ করল কেন? আমি তো জাস্ট মজা করে বলেছিলাম! এতে এত রাগ করার কী আছে? মেয়েরা যে কোন সার্কিট দিয়ে তৈরি, ভগবান জানেন! এত কমপ্লিকেটেড কেন? ইয়ারকিটা ইয়ারকির মতো নিতে পারে না? সব কিছুকে জটিল করে একটা মানে বের করতেই হবে?

আমার খিদেটা আবার বিরক্তির তলায় লুকিয়ে পড়ল। অণু এমন রাগ করল! আমার নিজের উপরই রাগ হল। সত্যি, আমারও হয়তো এমন বলা উচিত হয়নি। কাউকে কোনও কাজ করে দেব বলে সেটা নিয়ে "তোমায় কিছু করে দিচ্ছি" টাইপ কথা বলতে নেই। ইয়ারকি মেরেও বলতে নেই। এটা আমি নতুন করে বুঝলাম। আসলে অণু ওই ব্যাপারটা নিয়ে একটু সেনসিটিভ হয়ে আছে। আর হবেই, নিলয় যেভাবে ওর পিছনে লেগেছে!

সেদিন শরবতের দোকানে অণুর দিকে তাকিয়ে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, ঠিক কী বলতে চাইছে ও। তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ঠিক কী বলতে চাইছ বলো তো?"

"তোমাদের কাজটা হয়ে যাবে। টেনশন কোরো না!" অণু বরাভয়ের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল।

"মানে? কীভাবে হবে?"

"সিম্পল। আমি গিয়ে জেঠুকে বলব। ইউনিভার্সিটির সিভিলের হেড ডিপ আমায় নিজের মেয়ের মতো ভালবাসেন। নরেন জেঠু। ওঁকে বলে

দেব, যাতে প্রোটোকলের জন্য অনর্থক সময় না নষ্ট করে। তোমাদের দরকারটা উনি বুঝলেই কাজটা হয়ে যাবে।"

"ওরে বাবা! ডক্টর নরেন জোয়ারদার তোমার জেঠু?" আমি খাবি খেয়েছিলাম।

"নিজের নন, তবে আমায় ভালবাসেন খুব। উনি তো চেয়েছিলেন, ওঁর বাড়িতেই আমি থাকি। কিন্তু থাকিনি। ওঁর বোনও ওঁদের সঙ্গেই থাকেন। শেলিপিসি। বিয়ে-শাদি করেননি। কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেন। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। খুব রাগী! মানে, নরেন জেঠু যতটা ভাল, শেলিপিসি ততটাই রাগী! ওরা কিন্তু আবার নীতীশ জেঠুদেরও খুব ঘনিষ্ঠ হন," অণু এক নিশ্বাসে কথা বলে থেমেছিল।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কিন্তু আমাদেরটা আর দু'-তিনদিনের মধ্যে দরকার। উনি কি মানবেন সেটা? মানে, ওঁর অফিসের লোকজন তো একরকম ফুটিয়েই দিয়েছে আমাদের। উনি ছুটিতে আছেন তো। তাই..."

"ধ্যাৎ", হেসেছিল অণু, "তোমায় বললাম না যে, সেসব কিছু নয়। ফালতু টেনশন করতে খুব ভাল লাগে, না? হয়ে যাবে কাজটা। কাল শুধু আমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটি যেয়ো। কেমন?"

হাতে চাঁদ না পেলেও অণুকে পেয়েছিলাম আমি! মনে হচ্ছিল, তখনই গুপ্তসাহেবকে ফোন করে জানিয়ে দিই যে, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু না, তা করিনি। এ হল বামুনবাড়ির নেমন্তন্ন, না আঁচালে বিশ্বাস নেই! আমি সামনে তাকিয়েছিলাম। অণু হাসছিল। কীসব কথা বলে যাচ্ছিল আমায়। ওর ক্লাসের কথা। ও বই পড়ার কথা। বন্ধুদের কথা। আর ছোট্ট ঠোঁট দুটো দিয়ে মাঝে মাঝে স্ট্র ডুবিয়ে শরবত খাচ্ছিল। ওর ওই বড় বড় চোখ আর গালের লম্বা টোল দেখে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল! আমি ওয়েটারকে ডেকে আর একটা শরবতের অর্ডার দিয়েছিলাম।

পরের দিন আমার জাস্ট পনেরো মিনিট সময় লেগেছিল। নরেন জেঠু ছুটির পরে যোগ দিয়েছিলেন সেদিন, ফলে প্রচুর কাজ ছিল ওঁর।

ব্যস্ত ছিলেন। তবু তার ভিতরেই অণুকে দেখে হইহই করে উঠেছিলেন, "অ্যাটম তুই? এতদিনে বুড়োকে মনে পড়ল? এক ক্যাম্পাসে আসিস, তাও দেখা করার সময় হয় না তোর? খুব ব্যস্ত নাকি রে?"

অণু হেসেছিল, "তা তো একটু ব্যস্ত বটে।"

নরেন জেঠু বলেছিলেন, "তাই? তবে সেক্রেটারি রাখ!"

"কী যে বলো না তুমি!" অণু আর সময় নষ্ট করেনি। আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়ে সমস্ত ঘটনা বলেছিল।

"তুমি পোদ্দারে চাকরি করো?" নরেন জেঠু হেসেছিলেন, "আর নীতীশের ওখানে থাকো? বাঃ! তা অণুকে যখন উকিল ধরেছ, তখন তো তোমার কথা শুনতেই হয়। ঠিক আছে। আমি বলে দিচ্ছি। কাল বা পরশু সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে। ডোন্ট ওয়ারি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার!" আমি আর কী বলব বুঝতে পারছিলাম না।

"আজ তো সময় নেই। তাই কথা বলতে পারলাম না। একদিন অণুর সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসো। আড্ডা দেওয়া যাবে। কেমন?"

'কেমন' মানে যে 'এখন এসো' সেটা আর বলে দিতে হয়নি আমাকে। আমাদের সিভিলাইজড ভোকাবুলারি একটা জিনিস! আমার বেশ মজা লাগে। কী সুন্দর। ভদ্রভাবে একজনকে রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া যায়।

বাইরে বেরিয়ে এসে আমি নরেন জেঠুর কথামতো সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিলাম। এই ভদ্রলোকই এককালে আমাদের লম্বা রাস্তা দেখিয়েছিল! এখন পুরো ডিগবাজি খেয়ে কালকেই দিয়ে দেবে বলে পারলে নিজের কোলে নিয়ে বসানোর উপক্রম করেছিল আমায়। মজা লাগছিল বেশ। আসলে 'পরিষেবা' বলে যে নামটি এখানে ব্যবহার করা হয়, তা আসলে ইনফ্লুয়েন্স থাকলে পাওয়া যায়। না হলেই আপ কাতার মেঁ হ্যায়!

বাইরে বেরিয়ে এসে আমি বলেছিলাম, "নরেন জেঠু কিন্তু গ্রেট!"

আমার প্রশংসায় পাত্তা না দিয়ে অণু বলেছিল, "এবার আমার একটা কাজ করে দেবে?"

"নিশ্চয়ই," আমি ছোটবেলায় টিভি সিরিয়ালে দেখা দাতাকর্ণের পোজ নকল করে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে।

অণু চোখ সরু করে বলেছিল, "অতটা অ্যাটিটিউড না দেখালেও চলবে। আমার কাজটা হল নিলয়।"

"মানে?" আমি আবার কর্ণ থেকে লোডশেডিং-এ দেশলাই হাতড়ানো মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম!

"নিলয় তোমার কাছ থেকে জানতে চায় যে, তুমি আমার প্রেমিক কিনা। প্লিজ, তুমি ওকে বোলো যে, আমাদের মধ্যে সত্যিই সম্পর্ক আছে, প্লিজ।"

"অ্যাঁ?" আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, "কেন? আমায় তোমার প্রেমিক সাজতে হবে?"

অণু কিছু বলতে গিয়েও থমকে গিয়েছিল সামান্য। চোয়াল শক্ত করে নিয়েছিল, তারপর একদম আচমকা বলেছিল, "কেন, মিকির চেয়ে আমি খারাপ?"

"এসব কী বলছ?" আমার গলার সঙ্গে বুকও শুকিয়ে আসছিল। ইউনিভার্সিটির মাঠ, দূরের গাছপালা, পুরনো বিল্ডিং, সব কেমন যেন আউট অফ ফোকাস হয়ে যাচ্ছিল!

"ও কে, বাদ দাও। কিছু করতে হবে না।" অণু আর দাঁড়ায়নি, হাঁটা দিয়েছিল।

"আরে, চটছ কেন?" আমি পিছন থেকে দৌড়ে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, "এটা তো সামান্য অ্যাক্টিং, ঠিক করে দেব। জাস্ট প্রিটেন্ড করতে হবে তো? ওঃ, করে দেব। তোমার নিলয়কে বোলো কখন দেখা করতে চায়, আমি চলে যাব। কেমন?"

অণু চোখের দৃষ্টিতে তির সংযোজন করেছিল, "আমায় দয়া করতে হবে না।"

"না, না, দয়া নয়," কী বলে যে ওকে শান্ত করব, বুঝতে পারছিলাম না, "তোমার বন্ধু হিসেবে এটা আমি করতেই পারি।"

অণু মাথা নিচু করে নিয়েছিল হঠাৎ। তিরটা আর না ছুড়ে ভরে রেখেছিল তূণীরে। তারপর শান্ত গলায় বলেছিল, "ঠিক আছে। না হয় মিথ্যেই বোলো।"

সে না হয় বলব, কিন্তু এভাবে যে-মেয়েটা রান্না করে দিয়েছে, তাকে এসব না বললেই ভাল হত। টিফিন বক্সের ভিতর পড়ে থাকা অসংখ্য কেঁচো সেদ্ধর মতো নুড্‌লসের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আমার খাওয়ার যে-ইচ্ছেটা এতক্ষণ চাপা পড়েছিল, সে এবার মারা গিয়েছে।

আবার ফোনটা পিকপিক করে ডেকে উঠল হঠাৎ! অণু কি? প্রায় হাতে ধরা টিফিন বক্সটা উলটে কোনওমতে ফোনটা ধরলাম! ধুস, দাদা! অণু নয় বলে কেন যেন আমার মনটা আবার গোঁত্তা খেয়ে মাটিতে নামল! মাটি চিবোনোর মতো লাগল মুখটা। অণু নয় কেন? অমন বলেছি বলে মেয়েটা কি খুব রাগ করল?

শ্রী-র সঙ্গে দেখা করার পর থেকে আমি দাদাকে অ্যাভয়েড করছি কয়েকদিন। দাদার ফোন ধরছি না। এমনকী, মেসেজেরও রিপ্লাই দিচ্ছি না। কিন্তু আজ মনটার দাঁড়িপাল্লা ঠিক নেই বলেই বোধহয় ফোনটা ধরে ফেললাম।

দাদা কেমন যেন অগোছালো গলায় বলল, "লাল, এই লাল..."

"হ্যালো? কী হয়েছে?" দাদার গলাটা আমার ভাল লাগল না।

"লাল আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলেছি। প্রায় তিরিশটার মতো খেয়ে ফেলেছি। বাড়িতে কেউ নেই... আমার... আমার..." দাদার কথা কেমন যেন জড়িয়ে আসছে!

"কী?" আমি চিৎকার করে উঠলাম।

"আমার কেমন যেন করছে! আমি... আ..." দাদা কথা শেষ করার আগেই ফোনটা কেটে গেল।

আমি ফোনটার দিকে তাকালাম। এখন কী করব? কাকে ফোন করব? কে আছে দাদার কাছে? দাদার নম্বরটা ডায়াল করলাম। আমার হাত কাঁপছে। ঘাম হচ্ছে। মনে হচ্ছে, পায়ে জোর নেই একটুও। তিরিশটা

ওষুধ খেয়েছে? এটা কি ফ্যাটাল? এতে কি মানুষ মারা যায়? জানি না। আমার মনের ভিতর আবার লোডশেডিং নেমেছে। দাদার ফোন বেজে চলেছে। ধরছে না। এবার কী হবে? কাকে ফোন করব? দ্রুত পায়ে অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে ফোনবুক খুঁজে একটা নম্বরে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার আঙুল থমকে গেল এক মুহূর্ত! করব একে ফোন? তারপর আর সময় নষ্ট করলাম না। কল বাটনটা টিপে ফোনটা কানে লাগালাম। আমাদের বাড়ি থেকে অফিস খুব কাছে। দাদার কাছে পৌঁছোতে বেশি সময় লাগবে না বাবার!

দশ

কত দিন পর আবার মায়ের ছবিটা দেখলাম! শান্ত, হাসিমুখে মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরনে সিলভারের উপর নীল প্রিন্টের শাড়ি। একটা উঁচু পাহাড়ের উপরে ম্যালের মতো জায়গায় ছবিটা তোলা। মাথার পিছনে মেঘলা আকাশ আর পাহাড়ের সবুজ গাছের সারি। মা হাসছে! ছবিটা আমার শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল। আমি যাওয়ার সময় নিয়ে যাইনি। কারণ, ছবিটা খুব বড় করে ল্যামিনেট করানো। কী জানি, যেখানে যাব সেখানে জায়গা হবে কিনা! আমার সঙ্গে সবসময় মায়ের একটা ছোট ছবি এমনিই থাকে।

তবে সেদিন ওই ছবিটা বেশ কিছুদিন পরে দেখেছিলাম বলেই কিনা জানি না, হঠাৎ কেমন যেন কষ্ট হয়েছিল গলার কাছটায়! আমি জানি না, গলার সঙ্গে কষ্টের কী সম্পর্ক আছে। কিন্তু দেখেছি কষ্ট হলেই কেমন যেন গলার কাছে একটা রবারের বল আটকানোর মতো ব্যথা হয়! আসলে সত্যি তো আমার মা ছাড়া আর কথা বলার তেমন কোনও লোক ছিল না। তাই মায়ের মৃত্যুটা আমার কাছে কেমন যেন অন্ধকার গুহার মতো মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, মা আমায় এমন একটা

গুহার মাঝে রেখে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে।

সেই অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে গুহাটা বারবার আমার জীবনে ফিরে এসেছে। আর সেখান থেকে আলোর কাছাকাছি পৌঁছোতে আমায় যথেষ্ট লড়াই করতে হয়েছে। ঘরে দাঁড়িয়ে, মায়ের সেই ছবি, আমার বিছানা, টেবিল, আলমারি, দেওয়ালে ঝোলানো ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট — সব দেখে কেমন যেন একটা নরম বালির মতো দুঃখ ঝরে পড়ছিল মাথায়। কেমন যেন জ্বালা করছিল চোখ! আমার অবাকই লাগছিল। এটা তো প্রথম নয় যে, আমি বাড়ির বাইরে আছি। এর আগেও বহুদিন আমি বাইরে কাটিয়েছি। কিন্তু কোনওবার তো এমন হয়নি! তা হলে?

দাদা এখন সুস্থ আছে। তবে মানসিকভাবে ডিস্টার্বড হয়ে আছে বেশ। আমাদের হাউজ ফিজিশিয়ান বলেছেন, একজন সায়কায়াট্রিস্ট দেখাতে। সেদিন অফিসে ফোনটা পেয়ে আর কোনও উপায় না দেখে বাবাকে ফোন করতে বাধ্য হয়েছিলাম। অস্বস্তি হচ্ছিল, ভিতরে ভিতরে আমার ইগো আমাকে পিছনে টানছিল। মনে হচ্ছিল, কই, বাবা তো আমায় এই ক'দিনে একবারও ফোন করেনি। বাড়ি থেকে চলে আসার সময়ও তো একবারও বলেনি, যাস না। তা হলে আমি কেন নিজে থেকে ফোন করব? বাবার নিজের ইগো কি সন্তানের ভালবাসার চেয়েও বেশি? এসব যে আমি খুব প্ল্যান করে চিন্তা করেছিলাম, তা নয়। বা আমি দশ মিনিট ধরে কুলের আচার খেতে খেতে চিন্তা করেছিলাম তাও নয়। এই সমস্ত কথা আমার মাথায় এসেছিল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে! কিন্তু তারপর ফোনটা করে ফেলেছিলাম আমি। মানুষের চেয়ে আমার কাছে কোনওদিনই ইগোর দাম বেশি নয়!

ফোনটা চারবার রিং হওয়ার পর ধরেছিল বাবা। এত গম্ভীর মানুষটার গলাটা কিন্তু খুব নরম আর সুন্দর। আমি শুনেছিলাম সেই স্বর, "বলো।" বাবা এমন করে বলেছিল যেন সকালেও আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করেছে।

ছোট্ট করে বলেছিলাম, "দাদা অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ খেয়ে

ফেলেছে। বাড়িতে তেমন কেউ নেই। তুমি এখনই যাও, আমিও আসছি।"

"কী?" বাবার রিঅ্যাকশন বদলে গিয়েছিল নিমেষে!

আমি ফোনটা কাটার আগে বলেছিলাম, "তুমি দেরি কোরো না। ডাক্তারকে কল করে বাড়িতে যাও তাড়াতাড়ি। আমি বেরিয়ে পড়ছি।"

গুপ্তসাহেবকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলাতে উনি খুব উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, "ওরে বাবা, সে কী? তুমি যাও তাড়াতাড়ি। এ যে মরে... মানে সরি... তুমি যাও।"

মানিকতলায় আমাদের বাড়িটা বেশ পুরনো। যাকে লোকজন বনেদি বাড়ি বলে, সেরকম আর কী! আমাদের বাড়িতে একসময় অনেক লোকজন থাকত। কিন্তু এখন বাবার সব ভাইরাই বিদেশে সেট্‌ল করায় খালি হয়ে গিয়েছে বাড়িটা। কয়েকজন বলেছিল, নীচের অংশটা ভাড়া দেওয়ার কথা। কিন্তু বাবা সেসবে ঢোকেনি। বলেছিল, "মেনটেন আমরাই করতে পারব।"

আমি জানি, বাবা কী ভেবেছিল। ভেবেছিল, আমাদের দুই ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে, নাতি-নাতনি নিয়ে ভরিয়ে তুলবে বাড়িটা। কিন্তু ভগবান বলে একটা অদ্ভুত প্রজাতি আছে! অনেকটা ক্যাটালিস্টের মতো। তবে একটা তফাত আছে। মানুষ তাকে পজিটিভ ক্যাটালিস্ট হিসেবে ব্যবহার করতে চায় আর সে হয়ে যায় নেগেটিভ ক্যাটালিস্ট। মানুষের গুড়ে বালি ঢালতে তার যে কী সুখ, কে জানে! কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে সে তার কাজ করে যায়! বাবার বেলাতেও তার অন্যথা হয়নি।

বাড়িতে কাজের লোকদের বাবা বোধহয় আমি আসব বলে রেখেছিল। আমায় দেখে তারা তাই চমকায়নি। আমি কোনওদিকে না তাকিয়ে উপরে উঠে গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, বাবা আর ডাক্তারকাকু বসে রয়েছে দাদার সঙ্গে। আর দাদা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে।

আমায় দেখে বাবা কোনও কথা বলেনি। শুধু সরিয়ে নিয়েছিল চোখ। ডাক্তারকাকু নিচু গলায় বলেছিল, "পেট ওয়াশ করে দিয়েছি। নাথিং

সিরিয়াস। তবে অ্যালকোহল খেয়েছিল একটু। তাই অন্যরকম হলেও হতে পারত। এখন ঘুমোচ্ছে। চিন্তার কিছু নেই।"

অ্যালকোহল! মানে, শ্রী ঠিকই বলেছিল! আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল নিজেকে। বুঝেছিলাম যে, শ্রী-র সব কথা আমার মন মানতে চায়নি। এখন ডাক্তারের কথা শুনে বিশ্বাস হল! মানুষের মন মানুষ নিজেই বুঝতে পারে না! আচ্ছা, মিকিও কি তাই প্রথমে বুঝতে পারেনি! আমাকে হয়তো এমনিই পছন্দ করেছিল আর আমি সেটাকে একদম প্রেম, বিয়ে এসব ভেবে নিজেই হেদিয়ে মরেছি! দাদার ঘরে একটু সময় থেকে আমি চলে এসেছিলাম নিজের ঘরে। মায়ের ছবির সামনে দাঁড়িয়েছিলাম একা। আর ঠিক তখনই রবারের বলটা এসে ঢুকে পড়েছিল আমার গলায়।

কম কথার মানুষকে পৃথিবীসুদ্ধ লোক সমঝে চলে। হয়তো সে মাটির মানুষ তবু তাকে অন্যরা ভয় পায়। আমি যতই বাড়ি ছেড়ে চলে যাই না কেন, বাবা যখন আমার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল, এক মুহূর্তের জন্য হলেও আমার পিঠ দিয়ে ঠান্ডা এককুচি বরফ গড়িয়ে পড়েছিল। তবে নিমেষে আমি নিজেকে ঠিক করে নিয়েছিলাম। সত্যি তো, ভয় কী রে তোর ভীরু?

বাবা শান্ত গলায় বলেছিল, "হরিৎ এখন ঠিক আছে।"

আমি বুঝতে পারছিলাম না, বাবা এই কথাটা বলে কী বলতে চাইছে। দাদা ঠিক আছে, সেটা কি জাস্ট একটা ইনফরমেশন? না, এটা বলে আমায় বলতে চাইছে যে, আমার এবার চলে যাওয়া উচিত? আমি মিকির ঘটনা থেকে একটা শিক্ষা নিয়েছি। আমায় কেউ অপমান করার আগেই আমি এবার সরে যাব। আর গাল বাড়িয়ে দেব না লোককে চড় প্র্যাকটিস করার জন্য! ফলে আমি বলেছিলাম, "ও, তা হলে তো ভালই। আমি তবে আসি?"

বাবার ভুরুতে ওই প্রথম আমি ভাঁজ দেখেছিলাম। কিন্তু আমার বাবার ভিতর একটা লন্ড্রি আছে সেটা মুখের যে কোনও ভাঁজ নিমেষে

প্রেস করে দেয়! ফলে এটাও মিলিয়ে গিয়েছিল দ্রুত।

বাবা গম্ভীর গলায় বলেছিল, "সে যাবে। তুমি কি শ্রীকে খবর দিয়েছ?"

"না। ভাবলাম, সব কেটে গেলে দেব।"

"তুমি কি জানো, ওদের ভিতরে কী হয়েছে?" বাবার নিরুদ্বেগ গলার পলেস্তরা ড্যাম্প লাগা বাড়ির দেওয়ালের মতো ফুলে উঠেছিল।

আমি বাবার দিকে তাকিয়েছিলাম। মানুষটা কি হঠাৎ বুড়ো হয়ে গিয়েছে এই ক'মাসে? কেমন যেন কালচে লাগল বাবার মুখটা। মনে হল এতদিনের শক্ত করে ধরে থাকা লাগামটা যেন খুলে পড়ছে হাত থেকে!

শান্ত গলায় বলেছিলাম, "ওদের নিজেদের সমস্যা, ওরা মিটিয়ে নেবে। তুমি টেনশন কোরো না। শ্রীকে আমি বলব। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"ঠিক হয়ে যাবে?" বাবা প্রশ্ন করেছিল না আমার থেকে আশ্বাস চাইছিল, বুঝতে পারিনি।

কথা ঘোরাতে বলেছিলাম, "দাদার কাছে কে থাকবে রাতে? মানে, বাড়িতে তো ঠিক..."

"তোর পিসি, মানে মাধুকে বলেছি। ও আসছে," বাবা আর কী বলবে যেন বুঝতে পারছিল না।

"দাদা কখন উঠবে?" আমিও আনতাবড়ি প্রশ্ন করেছিলাম।

"জানি না। ডাক্তার তো বলল যতক্ষণ ঘুমোয়, ঘুমোক।"

"ও..." আমি এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে কী করব বুঝতে না পেরে বলেছিলাম, "তা হলে মানে... আমি আসি?"

বাবা দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে শুধু বলেছিল, "ভাল করে খেয়ো। অনেক রোগা হয়ে গিয়েছ তুমি।"

আমি মোবাইল তুলে সময়টা দেখলাম। সাড়ে চারটে বাজে। আজ

রবিবার, ছুটি। সারাটা সকাল ল্যাপটপে সিনেমা দেখে কাটিয়েছি। তারপর দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে বই নিয়ে বসেছিলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, নিজেই বুঝতে পারিনি। চারটে নাগাদ ঘুম ভেঙে এমনিই শুয়ে শুয়ে সাত-পাঁচ ভাবছিলাম। কিন্তু আর নয়। এবার উঠতে হবে। সাড়ে পাঁচটার সময় আমায় দেখা করতে যেতে হবে নিলয়ের সঙ্গে। গতকাল ফোন করেছিল ও। আমি তখন অফিসে ছিলাম। সামনে সোমবার, মানে, কাল আমাদের প্রাইস সাবমিট করতে হবে। সেটা নিয়েই গতকাল লাস্ট মিনিট রিভিউ চলছিল। তখন ফোনটা আসে। অচেনা নম্বর দেখে আমি প্রথমে তুলিনি ফোনটা। কে না কে করছে, করুক। কিন্তু তিনবার রিং হওয়ার পর গুপ্তসাহেব খেঁকিয়ে ওঠায় বাধ্য হয়ে ফোনটা ধরেছিলাম।

"হ্যালো? কে বলছেন?"

"আমি নিলয় বলছি লালদা।"

লালদা? শুনেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। মালদা জায়গার নাম হিসেবে ঠিক আছে। তা বলে লালদা? আর দাদা? নিলয়ের সঙ্গে এর আগে যতবার দেখা হয়েছে, তখন তো দাদা বলেনি। তখন বরং অণুর সামনে এমন ব্যবহার করেছিল যেন আমি ইনফ্যান্টে পড়ি। আর এখন একেবারে লালদা? কেন রে তুই কি কুড়ি বছরের পাখনা-গজানো ছেলে? তোরও তো বয়স আঠাশ হবে। অত ন্যাকামো করার দরকার কী তোর?

যেন চিনতে পারিনি, এমন গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, "নিলয় কে?"

"আরে, তোমার মেমরি এত খারাপ? আমি অণুর বন্ধু ভুলে গেলে?" নিলয় গাঁক গাঁক করে বলেছিল।

ভুলে আর যেতে পারলাম কই? জীবনের আবর্জনাগুলোকে যদি মন থেকে বের করে দিতে পারতাম, তা হলে তো অনেক ভাল থাকতাম। কিন্তু তা আর হল কই? আমি ভেবেছিলাম বলি, "কে অণু?" কিন্তু

সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বলে আর করিনি। বরং স্বাভাবিক গলায় বলেছিলাম, "আসলে অনেক কাজে থাকি তো তাই..."

নিলয় মাস্তানি দেখানো গলায় বলেছিল, "দ্যাটস নট অ্যান এক্সকিউজ। আমিও ব্যস্ত থাকি, তা বলে কি ভুলে যাই?"

আমি বলেছিলাম, "পরে কল করবে আমায়? খুব ব্যস্ত আছি।"

নিলয় সেই উপরচালাকি বজায় রেখে বলেছিল, "আমিও খুব ব্যস্ত আছি। পরে আরও ব্যস্ত হয়ে যাব। এখনই শুনে নাও চটপট। কাল তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি ভেনুটা পরে তোমায় টেক্সট করছি।"

পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল একদম! ছেলেটা কথাও বলতে শেখেনি। এমন ভাব করছিল, যেন ও নিজের সাব-অর্ডিনেটের সঙ্গে কথা বলছে। আমি দেখা করতে যাব মানে? তুই আসবি দেখা করতে!

আমি বলেছিলাম, "দ্যাখো, আমায় তো দেখতে হবে আমি আদৌ ফাঁকা আছি কিনা!"

নিলয় বলেছিল, "আরে, আমি অনেক কষ্টে সময় বের করেছি। আর তোমার আবার কাজ কী? বসেই তো থাকো। শোনো, নো এক্সকিউজেজ। কাল সাড়ে পাঁচটা শার্প। নাও এখন রাখছি। আমার খুব লেট হয়ে গেল।"

আমি কিছু বলার আগেই নিলয় ফোনটা কট করে কেটে দিয়েছিল। শালা! মনে হচ্ছিল, ফোনের ভিতর দিয়ে গিয়ে মালটাকে দিই কানের গোড়ায়! এসব ধরনের লোকজন কি চিরকালই পৃথিবীতে ছিল, না এখনই বেশি করে ছড়াচ্ছে? ফোনটা রেখে দেখেছিলাম গুপ্তসাহেব কটমট করে তাকাচ্ছেন আমার দিকে। আমার কপালটাই এমন! শাঁখের করাতের অবস্থা। নেহাত অণুর কাছে আমি ঋণী, তাই এসব অসভ্যতা সহ্য করছি। না হলে নিলয়কে ঝেড়ে অলিন্দ বানাতে কতক্ষণ!

বাথরুমে গিয়ে একবার ফ্রেশ হয়ে নেব। তারপর বেরোব। আজ সকালে নিলয় মেসেজ করে জানিয়েছে যে, এলগিন রোডের একটা কফি শপে

যেতে হবে। বাথরুমের দিকে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ ফোনটা পিকপিক করে ডেকে উঠল। আবার কে? আমি ফোনটা তুলে থমকে গেলাম। আরে, শ্রী!

"হ্যালো, শ্রী? কেমন আছ?"

"তুমি মানুষ? এতটা স্বার্থপর কেউ হতে পারে?" শ্রী চিৎকার করে উঠল।

আমি থতমত খেয়ে গেলাম! এটা কি কাফকার গপ্পো নাকি যে, আমি পোকা হয়ে যাব আর সে নিয়ে সারা বিশ্ব বুঝে, না-বুঝে "কী লিখেছে!" বলে হাততালি দেবে? যত দূর জানি আমি একটি পাতি মানুষ। কিন্তু সে নিয়ে হঠাৎ শ্রী-র কেন যে সংশয় দেখা দিল, সেটা বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "কেন, কী হয়েছে?"

"তোমার দাদা যে সুইসাইড অ্যাটেম্পট করেছে, সেটা তো তুমি আমায় জানাওনি।"

"আমি ভেবেছি, তোমায় বাড়ি থেকে ঠিক খবর দেবে। আর দাদা তোমায় কিছু বলেনি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না, ও তার পরের দিন আমায় মেসেজ করেছিল। কিন্তু আমি পাত্তা দিইনি। এর আগেও একবার সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের বোতল হাতে নিয়ে 'ফিনাইল খাব' বলে আমায় ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু তুমি আমায় জানাওনি কেন?"

"আমার ভুল হয়ে গিয়েছে শ্রী," কথা বাড়ালে কথা বাড়বে ভেবে সহজ সমাধানের দিকে গেলাম।

কিন্তু শ্রী-র যে এত সহজ সমাধান সহ্য হবে না, তা বুঝব কী করে? শ্রী বলল, "তা হলেই সাতখুন মাফ হয়ে গেল, না? আজ বাবা নিজে ফোন করেছিল। কী ভেঙে পড়েছে যে মানুষটা! তোমরা দুই ভাইই তো অমানুষ! বাবা ফোন করে আজ আমায় বলল যে, হরিৎ এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে। ছি, ছি তোমাদের জন্য কি মানুষটা একটুও শান্তি পাবে না? বাবা কী ভেঙে পড়েছে জানো?"

আমি অবাক হলাম, "বাবা ভেঙে পড়েছে? তোমায় বাবা বলল?"

"সব কি বলতে হয়? মেয়েরা সব বুঝতে পারে।" শ্রী এমন করে বলল যে, এরপর আর কোনও কথাই চলে না।

এটাই আমার আশ্চর্য লাগে। মেয়েরা নাকি সব বুঝে যায়! কী করে যায়? আর যদি বুঝে যায় তা হলে তারা ছেলেদের দুঃখ দেয় কেন? ছেলেরা না হয় বোঝে না। কিন্তু মেয়েরা তো বোঝে, তা হলে? জানি জানি, এমন করে ভাবা ঠিক নয়। জেন্ডার বায়াসনেস খুব খারাপ জিনিস। তবু যখন শুনি, মেয়েরা সব বুঝতে পারে, তখনই কেন জানি না আমার এসব খারাপ খারাপ কথা মনে আসে।

"কী হল?" শ্রী ধমক দিল, "কথা কানে যাচ্ছে না? চুপ করে আছ কেন? কেমন আছে তোমার দাদা?"

"দাদা ভালই আছে। গতকাল ফোন করেছিলাম। শুধু মাঝে মাঝে এখনও তোমার জন্য কাঁদছে।"

"কাঁদছে?" শ্রী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, "আবার ন্যাকামো শুরু করেছে? ডিসগাস্টিং।"

বুঝলাম, লখিন্দরের বাসর ঘরে এবার একটু ছ্যাঁদা হয়েছে! সেই ফাঁক দিয়ে আমার মতো ছেলেকে এবার ঢুকতেই হবে। বললাম, "আচ্ছা তুমি কি আজ গেছ দাদাকে দেখতে?"

"না, যাইনি। যাবও না। আমি কি সস্তা নাকি?" শ্রী এমন করে বলল যে, আমার খারাপ লাগল।

বললাম, "সস্তা-দামির কথা উঠছে কেন? নিজেকে কোনওদিন এভাবে দেখো না। দাদা খুব খারাপ। তোমার সঙ্গে না হয় খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। কিন্তু তারপরও তো সে একটা মানুষ। আমার অন্যায় হয়েছে, আমি জানি। কিন্তু রাগ, জেদ, ইগো এসব টেনে আর কত দূর নেবে? আমি মানুষ না হতে পারি, কিন্তু তুমি যে মানুষ, সেটা অন্তত প্রমাণ করো!" ফোনটা কেটে খাটের উপর ছুড়ে ফেললাম। আমার হাত-পা জ্বলছে। এমন কথাগুলো শ্রীকে বলতে আমার খারাপ

লেগেছে। কিন্তু কোনও কোনও সময় মানুষকে কঠিন কথা তার ভালর জন্যই বলতে হয়। কিন্তু তবু, ভাল কাজ মনে করলেও আমার কষ্ট হচ্ছে। সত্যি কথার মতো কষ্টদায়ক জিনিস খুব কমই আছে। এ যেন উচ্ছে! উপকারী, কিন্তু তেতো। কেন যে আমাদের জীবনটা এমন হয়। যা কিছু উপকারী, তাই এমন বদখত হয় কেন?

ধ্যাত, আমি গলায় কাঁটা ফোঁটার মতো অস্বস্তি নিয়ে বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এলাম। একটা সাদা শার্টের উপর জিন্‌স পরে আলমারি থেকে হাফ সোয়েটার বের করে পরতে যাব, হঠাৎ দরজায় ঠকঠক শুনলাম। আবার কে এল। কাকিমা নাকি? উনি মাঝে মাঝে আজকাল এটা-ওটা কিনতে দেন আমায়। আজও কি দেবেন নাকি?

"দরজা খোলা আছে," আমি গম্ভীর গলায় বলে সোয়েটারে মাথা গলালাম। আর মাথা বের করেই চমকে উঠলাম! অণু!

"তুমি?" আমি হাসলাম, "সারাদিন দেখিনি। কোথায় ছিলে? খাওয়ার সময় ভাবলাম, তুমি কোথায়। রোববার করে তো তুমি স্পেশ্যাল কিছু রান্না করো।"

"সেই জন্য মনে হয়েছিল!"

অণুর সেই লম্বা টোলের হাসি কোথায় গেল কে জানে? আমার কেমন যেন লাগল। আজ দিনটা ঠিক আমার নয়। বললাম, "আরে, তা নয়। মানে, মনে হল, তাই বললাম।"

"ও," অণু ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "আমি আজ একটা ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

"তাই?" আমার গলার কাঁটা নড়েচড়ে কেমন যেন বুকের দিকে নামতে লাগল, "কেন?"

"আমার বয়স সাতাশ। বাবা-মা বিয়ে নিয়ে চিন্তিত। ওরা সম্বন্ধ দেখছে। ওরা পছন্দ করে তেমনই একজন ছেলের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে বলেছিল। ওদের সেই ছেলেকে পছন্দ হয়েছে। এবার আমি যা বলব! তাই আজ সেই ছেলেটার সঙ্গে সকালে গিয়ে একটা ফিল্ম

দেখলাম। তারপর লাঞ্চ করলাম। নিউ মার্কেট থেকে ওর কিছু শপিং করার ছিল। সেখানেও সঙ্গ দিলাম। ছেলেটা ডাক্তার। খুব ভাল ছেলে। অ্যান্ড দ্য বেস্ট পার্ট ইজ, গোঁফ আছে। ব্যবহারও খুব সুন্দর।"

কাঁটাটা হঠাৎ তার যাত্রাপথ পালটে মাথার ভিতর গোঁত্তা দিল। আমি চোয়াল চেপে বললাম, "তা এসব গল্প আমায় দিচ্ছ কেন? সারাদিন কী করেছ, সেটা তোমার ডিসক্রিশন। আমি শুনে কী করব? আমি এখন নিলয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।"

"না," অণুর গলাটা আরও খাদে নেমে গেল, "তার আর দরকার নেই।"

"মানে?" আমি ভুরু কুঁচকে তাকালাম ওর দিকে।

"ভাবলাম, বিয়ে যখন করতেই হবে, তখন আর অপশন বাদ দিই কেন? বাবা-মায়ের কথা অনুযায়ী একজনের সঙ্গে দেখা করলাম। নিলয় এতদিন ধরে পিছনে পড়ে আছে। দেখি, সত্যি ও আমায় ভালবাসে কিনা। আসলে আমাদের যে ভালবাসে, সেটাই তো আসল। আমরা কাকে... বাদ দাও। তোমায় যেতে হবে না।"

কাঁটাটা কোথায় ফুটেছে? মাথার কোথায় কাঁটা ফুটলে সারা শরীর এমন অসাড় হয়ে যায়? আমি তাকিয়ে রইলাম অণুর দিকে। অণুও, কী আশ্চর্য, চোখ সরিয়ে নিল না। তাকিয়ে রইল। শীতের কলকাতা শেষ বিকেল থেকে ধীরে ধীরে বাঁক নিচ্ছে গাঢ় সন্ধের দিকে। দেখতে পেলাম, রাস্তায় সার দিয়ে জ্বলে উঠছে আলো। আমাদের কী বলতে চায় এসব আলোরা? অন্ধকার নেমে এলে কে তাদের জ্বালিয়ে রাখে শহর জুড়ে? সেই আলো কি পথ দেখায়? না চোখ ধাঁধিয়ে দেয়? আমি বাদুড়ের মতো আলোয় অন্ধ প্রাণী হয়ে তাকিয়ে রইলাম অণুর দিকে। মনে হল, ও যদি বিয়ে করে চলে যায়, তা হলে রবিবারের মেনুতে একটা করে স্পেশ্যাল পদ কে রান্না করে রাখবে?

এগারো

ছোটবেলা থেকেই মাঝে মাঝে আমার মা একটা স্বপ্ন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখত। একটা অনেক উঁচু ইলেকট্রিকের গ্রিড হয়ে মাইলের পর মাইল তার চলে যাচ্ছে। আর সে তারের উপরে বসে লেজ নাড়াচ্ছে একটা ফিঙে। আর কোথাও কিছু নেই। শুধু একটা তার, পিছনে মনখারাপের মতো নীল আকাশ আর একলা, নির্জন, একটা ফিঙে। সে মাঝে মাঝেই এসে লেজ নাড়াত মায়ের স্বপ্নের মধ্যে। মা একজনকে জিজ্ঞেস করেছিল সেই স্বপ্নের মানে। সে বলেছিল, মায়ের ভিতরে নাকি সব ছেড়ে একা হয়ে কোথাও চলে যাওয়ার প্রবণতা আছে। মা নাকি সব ছেড়ে কোথাও চলে যেতে চায়। মায়ের নাকি অন্য কোথাও একটা পৌঁছোনোর আছে। নতুন গন্তব্য খোঁজার স্বপ্ন আছে। তাই স্বপ্নে এমন একটা ফিঙে এসে বসে আর নাজেহাল করে মারে মাকে! দাদা হওয়ার পরেও মা এই স্বপ্নটা দেখত। কিন্তু যেই আমি এলাম, সেই ফিঙেটা স্বপ্ন থেকে উড়ে যে কোথায় চলে গেল! আমি এই গল্পটা শুনতে শুনতে মাকে জিজ্ঞেস করতাম, "কোথায় গেল মা? সেই ফিঙেটা কোথায় গেল?" মা আমায় টেনে নিয়ে আমার গায়ে নাক ডুবিয়ে বলত, "এই তো আমার বুকের কাছে। এই তো আমার চোখের মাঝে এসে সে বসেছে। এই তো আমার ফিঙে।" মা আমায় খুব আদর করে মাঝে মাঝে 'ফিঙে' বলে ডাকত! মা যেদিন মারা গেল, নিমতলার শ্মশানে দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে দেখেছিলাম ইলেকট্রিকের তারে এসে বসে লেজ নাড়াচ্ছে একটা ফিঙে! যেন এখনই সে উড়ে যাবে, সব ছেড়ে সে চলে যাবে, যেন তাকে পৌঁছোতে হবে কোথাও। আর তারপর সত্যি সে চলে গিয়েছিল। মায়ের দেহ চুল্লির আগুনে দিয়ে আমি বাইরে এসে দেখেছিলাম তারটা শূন্য! ফিঙে চলে গিয়েছে। আমার মনে হয়েছিল, মাকে কি নিয়ে চলে গেল ফিঙেটা? না মা নিয়ে গেল ওকে?

আজ গুপ্তসাহেব যখন আমার সামনে ওই কাগজের তাড়াটা বাড়িয়ে

দিয়েছিলেন, আমি অবাক হয়ে জানলা দিয়ে দেখেছিলাম একটা ফিঙে এসে বসেছে বাইরের তারে।

গুপ্তসাহেব বলেছিলেন, "কী ঠিক করলে লাল? যাবে?"

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, "কোথায় স্যার?"

"সে কী? মোনালিসাকে দেখবে না?" গুপ্তসাহেব কথাটা বলে নিজের চেয়ারে হেলিয়ে বসেছিলেন।

"মোনা...ও প্যারিস?" আমার বোধোদয় হয়েছিল, "কিন্তু পোদ্দারস্যার তো বললেন, জুনে যেতে হবে।"

"আরে, যেতে হবে জুনে। তার মানে কি এখন আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলেই হবে ? কনট্র্যাক্ট পেপার সাইন করতে হবে না? আরও কিছু পেপার ওয়ার্ক আছে।"

"সে কী?" আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে তাকিয়েছিলাম গুপ্তসাহেবের দিকে।

"এটা কি বাচ্চা ছেলের খেলা? এমন একটা অপরচুনিটি আর তুমি সেটা নিয়ে মশকরা করছ? রাম-শ্যাম যাকে খুশি বলতে পারতেন পোদ্দারসাহেব। তোমায় বলেছেন, সেটা তোমার ভাগ্য। আর তা তুমি অবহেলা করছ? ওখানে গেলে ডলারে মাইনে পাবে। থাকা-খাওয়া সব কোম্পানির। আমরা আফ্রিকা আর ইউরোপে জয়েন্ট ভেঞ্চারে নতুন করে ঝাঁপাব। শোনো, সবাই আমেরিকা-আমেরিকা করে, কিন্তু জানবে আসল জিনিস হচ্ছে ইউরোপ। মডার্ন সিভিলাইজেশন কী, সেটা ইউরোপ ছাড়া বুঝতে পারবে না। এমন একটা সুযোগ আর তুমি বসে বসে জুন মাস দেখছ? আমি প্রায় সবক'টা কন্টিনেন্ট ঘুরেছি। ইউরোপের মতো সুন্দর আর কিছু নেই। এমন রহস্যময়, কালচার্ড, অ্যাডভ্যান্সড জায়গা আর কোথাও নেই। ওয়েক আপ বয় অর ইউ উইল মিস দ্য ট্রেন।"

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "স্যার, কতদিন থাকতে হবে?"

"এটা কি তুমি পুরী যাচ্ছ যে, সাতদিন ধরে সমুদ্র দেখে ফিরে এসে

সাতাশ দিন ধরে সেই গল্প পাড়ার লোকদের করবে? এটা কাজে যাচ্ছ। বলো, কী করবে?"

আমি 'চেক' শোনা দাবাড়ুর মতো মুখ করে গুপ্তসাহেবের দিকে তাকিয়েছিলাম। সত্যি এবার কী হবে? ঠিক করতে পারছিলাম না। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "স্যার, আর কয়েকটা দিন সময় পাওয়া যাবে না?"

"এত সময় দিয়ে কী করবে বলো তো? প্রেমিকা বারণ করছে যেতে?" গুপ্তসাহেব আমার দিকে না তাকিয়ে ড্রয়ার খুলে একটা কাগজের তাড়া বের করেছিলেন, "এই যে কনট্র্যাক্টের পেপার। ঠিক আছে, আরও একটু নয়, অনেকটা সময় দিচ্ছি। টু উইক্স। ব্যস, তারপর কিন্তু আর নয়। আর শোনো আমি মোটামুটি বলে দিয়েছি যে, তুমি রাজি। ফলে সময় নিলেও আমায় ডুবিয়ো না। হ্যাঁ-ই বোলো। এই নাও, এটা রাখো। কনট্র্যাক্টটা ভাল করে দেখে নিয়ো।"

আমার সামনে গুপ্তসাহেব কাগজের তাড়াটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর ঠিক তখনই জানলা দিয়ে দেখেছিলাম, বাইরের তারে একটা ফিঙে এসে বসল। আর বসেই নাড়াতে লাগল লেজটা!

চলে যেতে হবে। সবাইকেই চলে যেতে হবে। আগে বা পরে চলে যেতেই হবে। কিন্তু তার আগে, যেটুকু সময় হাতে আছে, সেটুকু কাটিয়ে যেতে হবে প্রিয়জনের সঙ্গে। তাকে জানিয়ে যেতে হবে, তার জন্যই এসেছিলে তুমি। তাকে ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হচ্ছে খুব। আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে! এই মোটরবাইকে বসে কম্পিউটার গেমসের মতো এক একজনকে কাটিয়ে কাটিয়ে এগোনোর ফাঁকে কেন যে তখন থেকে মাথার ভিতর ফিঙেটা নাচছে, কে জানে! আমার পিঠের ব্যাগে গুপ্তসাহেবের দেওয়া কনট্র্যাক্টের পেপার। বিদেশে যেতে হবে। যেতেই হবে? কিন্তু এখানেই বা থাকব কেন? মিকি আমায় ছেড়ে গিয়েছে। বাড়ির লোকজন আমায় বাড়িতে ফিরতে বলেনি। আর কী আছে এখানে, যা আমায় বেঁধে রাখবে? কে আছে যে, বেঁধে রাখবে? আমি

গাড়ির বাক্সগুলো কাটাতে কাটাতে, লাল-সবুজ সিগনাল পেরোতে পেরোতে বুঝলাম, তবু কিছু একটা আছে! অ্যালজেব্রার মতো একটা 'X' নামে কিছু আছে, যা আটকে রাখছে আমায়। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ পেরিয়েও যে কিছুতেই নিজেকে প্রকাশ করছে না। কী সেটা? আমার মনের ফিঙে লেজ নাড়াতে নাড়াতে কী বলতে চাইছে আমায়? কার কথা বলতে চাইছে? কার কাছে পৌঁছোতে বলছে?

সন্ধের কলকাতা যেন জ্বর-শ্লেষ্মার রুগি। সব রাস্তা জ্যাম। আমার বাইক গলার মতো ফাঁকও নেই কোথাও। আমি পার্ক সার্কাস কানেক্টরে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে সামনে তাকালাম। এত অসংখ্য গাড়ি চড়ে মানুষ কোথায় যায়? এবার নিয়ম করে গাড়ি বিক্রি বন্ধ করে দিতে হবে ছ'মাসের জন্য। কলকাতার তো দম বন্ধ হয়ে যাবে। পকেট থেকে মোবাইল বের করে সময় দেখলাম। সোয়া সাতটা বাজে। আমার সাড়ে সাতটায় পার্ক স্ট্রিটের রেস্তরাঁয় পৌঁছোনোর কথা। কারণ, নিলয় নেমন্তন্ন করেছে!

না, না, তুমি ভুল পড়ছ না। নিলয়ই নেমন্তন্ন করেছে। কেন, আমিও প্রথমে বুঝতে পারিনি। আজ সকালে অফিসে সবে ঢুকেছি, এমন সময় ফোন করেছিল ছেলেটা, "হাই লাল, কেমন আছ?"

লাল, লালদা আবার লাল! এ ছেলেটার অবস্থা কন্টিনিউটি মেনটেন করতে না পারা ফিল্ম ডিরেক্টরের মতো। ব্যাটার স্মৃতিশক্তি খারাপ না অন্য কোনও প্রবলেম আছে কে জানে!

আমি বলেছিলাম, "হ্যাঁ, বলো নিলয়।"

"আমি খুব ব্যস্ত!" নিলয় এমন করে বলেছিল, যেন জি-এইট সামিটের পৌরোহিত্য করতে করতে ফোন করছে!

"তাই?" আমি ধীরে ধীরে বলেছিলাম, "আমি একদম ব্যস্ত নই! আজ সকাল থেকে ছিপ নিয়ে পুকুরপাড়ে বসে মাছ ধরছি!"

"অ্যাঁ?" একটু থমকেছিল নিলয়, "সে কী? চাকরি করতে না কী একটা! সেটা গিয়েছে নাকি?"

"হ্যাঁ তাড়িয়ে দিয়েছে। কী করব বলো! তাই সকালবেলা ব্যাগপত্তর নিয়ে বেরিয়ে একটা পুকুরে বসে মাছ ধরি।"

নিলয় আবার থমকেছিল। হয়তো ভাবছিল, আমি কি সত্যি বলছি? এভাবে কেউ বলে? না ইয়ারকি মারছি? তারপর বলেছিল, "শোনো, আর বাজে কথায় সময় নষ্ট করছি না। আজ সন্ধেবেলা আমি তোমায় ইনভাইট করছি। ডিনার করবে আমার সঙ্গে।"

"হঠাৎ?" আমি বলে ফেলেছিলাম।

"তোমার সঙ্গে সেই দেখাটা তো আর হল না। অণু বলল, দরকার নেই। তোমাদের নাকি ব্রেক-আপ হয়ে গিয়েছে। তাই ভাবলাম, আমি কাউকে নেমন্তন্ন করে ফেরাই না। ফলে আজ পার্ক স্ট্রিটে চলে এসো। সাড়ে সাতটায়। আমি টেক্সট করে দিচ্ছি জায়গার নামটা। কেমন?"

"ঠিক আছে", আমি হেসেছিলাম, "তা বিশেষ কোনও উপলক্ষ নেই বলছ?"

"আরে, এসো না। মনে রাখবে, কেমন খাইয়েছিলাম আমি। বাই।" নিলয় ওর জি-এইট সামিটে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলেই বোধহয় আমার কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফোন কেটে দিয়েছিল।

ফোনটা কেটে চুপ করে বসেছিলাম চেয়ারে। ব্রেক-আপ হয়ে গিয়েছে! অণু বলেছে ওকে? অণু বলেছে? কী ভেবেছে কী মেয়েটা? আমি কি ওর খেলার পুতুল? নিজে থেকেই বলবে প্রেম আছে। রান্না করে দেবে। হেল্প করবে নিজেই। তারপর হঠাৎ আবার ব্রেক-আপও ঘোষণা করে দেবে? এটা কি মামদোবাজি পেয়েছে? আমার মাথার ভিতর রাগের সঙ্গে একটা অস্থিরতা কাজ করছিল। ব্রেক-আপ হয়ে গিয়েছে? ভেঙে গিয়েছে সম্পর্ক? আচ্ছা! ফোনটা হাতে নিয়ে অণুর নম্বর বের করেছিলাম। ভেবেছিলাম একটা ফোন করি। বলি যে এসব কেন করছে ও? এমন করে কেন নিলয়কে বলছে! কিন্তু তারপর সামলেছিলাম নিজেকে। না, এমন করা যাবে না। কারণ, অণু যদি জিজ্ঞেস করে আমার তাতে কী, তবে কী জবাব দেব আমি? সত্যিই তো, আমার কী?

এমন ভোঁ মাথা নিয়ে যখন বসে আছি, ঠিক সেই সময়ই ডাক পড়েছিল গুপ্তসাহেবের ঘরে।

জ্যাম থেকে ছাড়া পেয়ে আমি আবার আমার বাইক ছোটালাম।

আর একটু এগোতেই ফোনটা এল। আমি আমার বাঁ কানে পিকপিক করে মোবাইলের রিং শুনলাম। কে হতে পারে? বাঁ হাত দিয়ে হেডসেটের বাটনটা টিপে ফোনটা রিসিভ করলাম, "হ্যালো?"

"লাল!" দাদার গলাটা কেমন যেন লাগল। দাদা চিরকালই নরমসরম, কিন্তু এবার যেন বেশি দুর্বল দেখাচ্ছে!

আমি বললাম, "কিছু বলবি? আমি বাইক চালাচ্ছি।"

দাদা ঠিক মতো শুনল বলে মনে হল না। যেন নিজের মনেই বলল, "সব শেষ হয়ে গেল লাল! সব শেষ!"

একটু ঘাবড়ে গেলাম। শুনেছি, যাদের সুইসাইডাল টেনডেন্সি থাকে, তারা একবার ব্যর্থ হলে বারবার চেষ্টা করে। আবার কিছু করল নাকি? বললাম, "কেন কী হয়েছে?"

"শুনলাম, ও নাকি পরীক্ষা দেবে কীসব চাকরির জন্য। আর ফিরে আসবে না আমার কাছে। আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল।"

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ইয়ারকি হচ্ছে? নিজে দুর্ব্যবহার করে, বাজে কথা বলে, গায়ে হাত তুলে এখন সাধু সাজা হচ্ছে? বাড়িতে বসে কপাল চাপড়ানো? কেন তুই গিয়ে নিয়ে আসতে পারছিস না শ্রীকে? তুই গেলে কি শ্রী তোকে চ্যাংদোলা করে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেবে? ন্যাকামো দেখলে গা জ্বলে যায়! সামনের একটা মিনিবাসের প্রায় বগলের তলা দিয়ে গলে গিয়ে বললাম, "কে বলল তোকে?"

"আমাদের একজন কমন ফ্রেন্ড দেখেছিল ওকে কলেজ স্ট্রিটে। সে-ই বলেছে। ওকে নাকি শ্রী বলেছিল। আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল!" দাদা স্টিম ইঞ্জিনকে লজ্জা দিয়ে ফস করে এমন শ্বাস ফেলল যে, মনে হল বুঝি কানে বাষ্প লাগল।

আমি জানি, ডিপ্রেশনে থাকা মানুষ আর মাতাল প্রায় একরকম! এরা এককথা পঁচিশ বার বলে আর নিজের মনে দুঃখ নিয়ে জট পাকায়! কেউ এদের সাহায্য করতে পারে না। ডিপ্রেশন চোরাবালির মতো। বেশি হাঁচোড় পাঁচোড় করলে আরও দ্রুত ডুবে যায় মানুষ। জানি, একে কিছু বলা বৃথা। তবে এটুকুও বুঝলাম যে, শ্রী এত কিছুর পরও দাদাকে দেখতে অন্তত একবারও যায়নি। আমার মুখটা কেমন যেন তেতো হয়ে গেল। নিজের ইগো কি মানুষের চেয়ে বড়? কার উপর রাগ দেখাচ্ছে? যার উপর রাগ দেখাচ্ছে শ্রী, সে যদি আর রাগ বোঝার মতো মানসিক অবস্থায় না থাকে, তা হলে এই রাগ দেখানোর কি কোনও মানে থাকবে? মানুষ কি তবে নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে? নিজের ইগো বা স্বার্থে হাত পড়লে অন্য কেউ তার কাছে গৌণ হয়ে যায়?

আমি বললাম, "দাদা, তুই এসব ভাবিস না বেশি। আমি এবার নিজে ওদের বাড়িতে যাব। ডোন্ট ওয়ারি। দেখবি, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

দাদা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, "কী জানি! আমি পাপ করেছি তো, তাই হয়তো আমার এমন শাস্তি হচ্ছে! তুই বাড়ি ফিরে আয় না লাল।"

বহু বছর পর যেন হঠাৎ আগুনের হলকার শেষে আমার শরীরে বৃষ্টি হল। দাদা আমায় বাড়ি ফিরতে বলছে? এতদিন পরে? মনটা কেমন হয়ে গেল যেন! আমি কষ্ট করে নিজেকে সামলালাম। মোটরবাইক আর ইমোশন মিশলে অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া কিচ্ছু হবে না। তা ছাড়া যার জন্য চলে এসেছি, সে কি বলেছে আমায় যেতে? ফলে আমি কেন নরম ন্যাতা হয়ে যাব?

নিজের গলার আর্দ্রতা ঢেকে সাধারণ গলায় বললাম, "রাখছি দাদা, পরে কথা হবে। বাই।"

মনখারাপ থাকলে দেখেছি, কলকাতায় জ্যাম আরও বেড়ে যায়! আরও খানিক নাজেহাল হয়ে, লাল-হলুদ সিগনালে ঠোক্কর খেয়ে যখন

নিলয়ের মেসেজে বলে দেওয়া রেস্তরাঁয় পৌঁছোলাম, তখন আটটা বাজে। আমি বাইরে একটা জায়গায় বাইকটা রেখে রেস্তরাঁয় ঢুকলাম। ভিতরে ঢোকামাত্র একজন অ্যাটেন্ডেন্ট এগিয়ে এসে নাম জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম। সে আমায় পথ দেখিয়ে হাসিমুখে পৌঁছে দিল দূরের কোনার দিকের একটা টেবিলে। আর সেখানে দাঁড়িয়েই আমার মুখের সব হাসি একনিমেষে বদলে ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেল। আর কী আশ্চর্য, পুরনো সেই বিকেলের কাঁটাটা আবার ফিরে এল রক্তের মধ্যে! দেখলাম, চালিয়াত নিলয়ের পাশে বসে আমার দিকে ওই বড় বড় চোখগুলো মেলে তাকিয়ে রয়েছে অণু!

এটাই সারপ্রাইজ? কঠিন দৃষ্টিতে নিলয়ের দিকে তাকালাম। আমাকে কি দেখাতে ডেকেছে যে, অণু ওর সঙ্গে প্রেম করছে?

নিলয় বলল, "আরে, বসো লালদা।"

আমি ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম। আবার 'দাদা' জুড়েছে! ব্যাটা ন্যাকা সাজছে নাকি? কিন্তু জানি, এই নিয়ে রিঅ্যাক্ট করলে ও আরও পেয়ে বসবে। একটা চেয়ার টেনে বসলাম।

"তোমার তো বললে চাকরি নেই। তা এত দেরি করলে কেন? বাঙালির কিছু হবে না কেন জানো? তারা সময়ের গুরুত্ব বুঝল না। আরে বাবা, টাইম ইজ লাইফ। যাই হোক, তোমার জন্য অপেক্ষা না করে আমরা ড্রিঙ্ক নিয়ে নিয়েছি। তা তুমি কী নেবে? ভডকা না স্কচ?"

ভাবলাম বলি, বাঙালি তো, তাই ভাবছি ডাবের জল দিয়ে শুরু করব বা ঘোলের শরবত! তোর মতো তো সাহেবদের ইয়ে পাড়িয়ে আসিনি যে, লেকচার দিয়ে স্কচ খাব। কিন্তু এবারও কিছু বললাম না। বরং দেখলাম, আমার চাকরি নেই শুনে অণু কেমন যেন অদ্ভুত মুখে তাকাল আমার দিকে!

"কী হল? কী খাবে?" নিলয় ব্যস্ততা দেখিয়ে হাত দিয়ে ওয়েটারকে ডাকল।

"ফ্রেশ লাইম একটা," অণুর থেকে চোখ সরিয়ে বললাম।

অর্ডার দিয়ে হাসল নিলয়। অণুকে বলল, "জানো, লালদা এখন সকালবেলা মাছ ধরতে যায়!"

অণু সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

আমি সামনে রাখা মেনুকার্ড তুলে তাতে মন দিলাম।

"হুঁঃ", নিলয় শব্দ করে হাসল, "আমার কাজ করে প্রাণ যাচ্ছে আর একজন মাছ ধরছে! জানো, একটা গাড়ি বুক করলাম আজ। সাড়ে তিন পড়বে। ছোট, কিন্তু আমাদের জন্য একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। দারুণ স্মুদ। সেই জন্য ভাবলাম, লালদা আর তোমায় বলি। তা ছাড়া তোমাদের যখন আর কোনও সম্পর্ক নেই, তখন ভাবলাম, আজ লালদার সামনেই আমি অণুকে..."

"ক'টা মাছ ধরলে?" অণু নিলয়কে কথা শেষ না করতে দিয়ে আমায় প্রশ্ন করল।

আমি সময় নিলাম একটু। আজকাল বাড়িতে থাকলেও আমাদের মধ্যে কথা হয় না। অণু আমাদের সঙ্গে বসে খায়ও না। এমনকী, রবিবারের স্পেশ্যাল রান্নাও বন্ধ। আমায় এড়িয়ে চলে সবসময়।

"একটাও না। আমি ঠিক মাছ ধরতে পারি না। অত দক্ষতা আমার নেই।"

অণু বলল, "কেন? নেই কেন? দক্ষতা নেই না সাহস নেই?"

আমি মেনুকার্ডটা থেকে চোখ না সরিয়ে বললাম, "মাছেরা সব অন্যরকম। আমার মতো সাদাসিধে মানুষ তাদের পছন্দ নয়! তারা বড় চারা দেখে খেতে যায়।"

"তা নিজের চারাটা বড় করলেই হয়।" অণুর গলাটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

"না, আমি যা, তাই ভাল। মাছ না হয় নাই পেলাম!" আমি কার্ডটা ভাঁজ করে জলের গ্লাস থেকে জল খেলাম।

"অন্ধরা আর ভিতুরা অনেক অজুহাত দেয়। ছিপ কিনতে জানে না, মাছ ধরতে গিয়েছে!" অণু রাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে নিলয়কে বলল,

"আমি দু'মিনিট বাইরে থেকে একটা চুইংগাম কিনে আনছি। এর সঙ্গে কথা বলার চেয়ে গাম চিবোনো ভাল।"

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। বুঝলাম, ঝগড়া যাতে না বাড়ে সেই জন্য দু'মিনিটের ব্রেক নিয়ে নিজেকে শান্ত করতে চলে গেল অণু।

"কী কেস? মাছ নিয়ে এমন ঝগড়া করলে কেন তোমরা?" নিলয় সামনে রাখা মুরগির একটা পিস তুলে অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

আমি কিছু বলার আগেই হঠাৎ আমার কানে লাগানো হেডসেটটা পিকপিক করে উঠল। বাঁচা গেল! আমি ফোনটা রিসিভ করলাম, "হ্যালো?"

"লাল, তোর সঙ্গে কি এখনও মিকির সম্পর্ক আছে?" পটাইয়ের গলায় এমন একটা প্রশ্ন সরাসরি শুনে আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। হঠাৎ এমন সময় পটাই ফোন করে এসব জানতে চাইছে কেন? মানে, কোনও কথা না বলে হঠাৎ সরাসরি এমন প্রশ্ন?

আমি সত্যি গোপন করেই চলেছি! তাই সেটাই বজায় রেখে বললাম, "হ্যাঁ তো। কেন?"

"তাই?" পটাইয়ের গলাটা অন্যরকম লাগল, "তা হলে লেকে স্যামের সঙ্গে ওকে আপত্তিকর অবস্থায় ধরে পুলিশ থানায় নিয়ে এসেছে কেন?"

"মানে?" ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম, "কী বলছিস তুই?"

"আমি স্যামের বাবার সঙ্গে থানায় এসেছি। আমাদের পাশের বাড়িতে থাকে ওরা। এসে দেখি, তোর প্রেমিকা! নাকি এক্স বলব? তুই এতদিন আমায় ঢপ মেরেছিলি?"

কী বলব বুঝতে পারলাম না। পটাই মিকিকে দেখেছে। আর বুঝলাম, পটাই রেগেও আছে খুব।

পটাই আবার বলল, "মিকি তোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।"

আরও ঘাবড়ে গেলাম! যে মেয়ে আমায় অমন বলেছিল, সে কথা

বলতে চাইছে? তাও থানা থেকে! কী বলব বুঝতে না পেরে পিছন ঘুরে নিলয়ের থেকে একটু দূরে গিয়ে বললাম, "মিকি কথা বলবে? মিকি?"

পটাই কী বলল, আমার আর মন দিয়ে শোনা হল না! দেখলাম, আমার একদম সামনেই দাঁড়িয়ে আছে অণু। চোয়াল শক্ত। চোখটা জ্বলছে। মিকির নামটা স্পষ্ট শুনেছে।

আমার হাত-পায়ের জোর কমে এল হঠাৎ। রেস্তরাঁটা যেন একটু টাল খেয়ে গেল। মনে হল, সত্যি এখন যদি সব ছেড়ে মাছ ধরতে যেতে পারতাম তা হলে কী ভালই না হত!

বারো

বেহালা অঞ্চলটা দেখলেই কেমন যেন টাকপড়া মানুষের কথা মনে আসে আমার। মানে পুরো টাক নয়, অল্প অল্প টাক পড়ছে যাদের। সব কেমন যেন পাতলা হয়ে আসা গাছপালা, রংচটা বাড়িঘর, ধুলো ওড়া পথ-ঘাট। আর জ্যাম। আর এসব মিলিয়ে টাক পড়ছে এমন একটা মানুষের ছবি ফুটে ওঠে আমার সামনে। কেন ওঠে, জানি না। কিন্তু ওঠে।

তারাতলা মোড়ের আগে থেকেই বাঁ দিকে টার্ন নিয়ে জেমস লং সরণি ধরে নিয়েছি। আগে এই রাস্তাটা বেশ ফাঁকা থাকত। কিন্তু এখন এটাও কেমন যেন চেপে গিয়েছে, ছোট হয়ে গিয়েছে। শীতের শেষ এখন। হাওয়ায় ধোঁয়ার চেয়ে ধুলো বেশি। ক্র্যাশ হেলমেটের সামনেটা উঠিয়ে বাইক চালাচ্ছি। দাঁতে-মুখে বালি কিচকিচ করছে। এখন দুপুর। বেহালা চৌরাস্তার কাছে একটা ল্যাবে যেতে হবে। একটা টেস্ট রিপোর্ট নিয়ে কথা বলতে হবে। একটা বড় টার্নকি প্রোজেক্ট পেয়েছি আমরা। সিভিল, মেকানিক্যাল আর ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে অ্যাশ হ্যান্ডলিং

সিস্টেম। থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্টের কাজ। কয়েক কোটি টাকার প্রোজেক্ট। গুপ্তসাহেব প্যারিস গিয়েছেন। আর যাওয়ার আগে আমায় এই প্রোজেক্টটার ব্যাপারে কলকাতা থেকে যা টেকনিক্যাল কাজ, তার চার্জে রেখে গিয়েছেন। এমনিতেই ফলতার কাজটা নিয়ে ব্যস্ত আছি, তার উপর এই কাজ! চাপে চ্যাপটা হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। কিন্তু গুপ্তসাহেব সেসব শোনেননি। বরং যাওয়ার আগে নিজেই আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন পোদ্দারসাহেবের অফিসে। বলেছিলেন, "চলো, পোদ্দারসাহেব তোমায় ডেকেছেন।"

আমি একটু অস্বস্তিতে ছিলাম। পোদ্দারসাহেবের সামনে গেলে কেমন যেন লাগে আমার! না, এই এত বড় একটা কোম্পানির মালিক বলে নয়, আসলে ওঁর চোখের দিকে তাকালে কেমন যেন লাগে। মনে হয়, যেন মনের ভিতরটা একদম দেখে ফেলছেন।

পোদ্দারসাহেবের কাছে গিয়ে গুপ্তসাহেব বরাবর সেই তেজি ভাবটা লুকিয়ে ফেলেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একটা অদ্ভুত অমায়িক গলায় বলেছিলেন, "স্যার, এই যে লাল এসেছে।"

"আও মেরে লাল!" পোদ্দারসাহেব প্রায় সব সময়ই একটু হালকা চালে কথা বলেন। প্রায় সত্তর বছর বয়স। আমার বাবার চেয়েও বড়।

হেসে ওঁর দেখিয়ে দেওয়া চেয়ারে বসেছিলাম।

"তুমি দুটো প্রোজেক্টের টেকনিক্যাল দিকের চার্জ বুঝে নিয়েছ তো?" পোদ্দারসাহেব কফিতে চুমুক দিয়ে বলেছিলেন।

"হ্যাঁ স্যার," ছোট করে বলেছিলাম।

"তো প্যারিস যাওয়ার ব্যাপারটা কী ঠিক করলে?"

"স্যার, আমি তো একটু সময় নিয়েছি।" ওঁর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে বলেছিলাম।

"টাইম হি তো নহি হ্যায় জি!" পোদ্দারসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে চোয়াল শক্ত করেছিলেন, "তুমহারা প্রবলেম কেয়া হ্যায়?"

"স্যার", মনে মনে একটা মিথ্যে সাজিয়ে নিয়েছিলাম, "বাবা ঠিক

রাজি হচ্ছেন না। একটু সময় নিচ্ছেন। তবে মত দিয়ে দেবেন মনে হয়।"

"বাবা?" পোদ্দারসাহেব আবার লম্বা সেই দৃষ্টিটা বাড়িয়ে আমার চোখ দিয়ে মনের ভিতর ঢুকে পড়ছিলেন। "বাবা? শিয়োর?"

থতমত খেয়ে বলেছিলাম, "মানে স্যার, বাবা স্যার..."

"বেটা, ইশক তো ঠিক হ্যায়। লেকিন কেরিয়ার মেঁ উয়ো রুকাবট না বন জায়ে। ঠিক হ্যায়, ঠিক সে দেখো। আমরা তো আর ইনডেফিনিট পিরিয়ড ওয়েট করব না! তবে ইউ আর আওয়ার ফার্স্ট চয়েস।"

গুপ্তসাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে ধ্যাতানি দিয়েছিলেন আমায়, "তুমি কি মরতে চাও? পোদ্দারসাহেবের সামনে তুমি ধানাই পানাই করছ! ইয়ারকি হচ্ছে! প্রেম করে কে কবে বড়লোক হয়েছে? তোমাদের যে কী না, আমি বুঝি না। আমি তো সারাজীবন প্রেম করলাম না। তাতে কিছু আটকেছে আমার? বড় গাড়ি, ফ্ল্যাট, বিদেশ... সব স্মুদলি হয়েছে। এসব ভ্যানতাড়া ছাড়ো। বুঝলে!"

কনট্র্যাক্টটা আমার বাড়িতেই আছে। সই করে দিলেই হয়, কিন্তু কেন যে সই করতে পারছি না, কে জানে! যতবারই সই করতে যাচ্ছি, আমার ওই যে একমাত্র সেন্সটা কাজ করে সে বলছে, এখন নয়, কিছু একটা হবে। দেখো, ঠিক কিছু একটা হবে! X ঠিক কিছু একটা করবে! জানি না, কী হবে, কখন হবে! X-টাই বা কে! তবু মনের ভিতর এই অস্বস্তিটা নিয়ে সই করতে পারছি না।

বাইকের স্পিড বাড়িয়ে সামনের দুটো গাড়িকে টপকালাম। ল্যাবে যাওয়ার চেয়েও আমার আর একটা কাজ আছে। সেটা সারতে হবে। এদিকেই যখন এসেছি, তখন শ্রী-র সঙ্গে একবার দেখা করে যেতেই হবে। দাদার ব্যাপারটা এমন একটা জায়গায় আছে যে, কেউ একজন উদ্যোগ না নিলে কিচ্ছু হবে না। আর সেই কেউটা আমিই। কারণ, আর কে করবে? আর কেউ যে নেই দাদার। চোদ্দো নম্বরের জ্যাম পেরিয়ে গাড়ি ছোটালাম। বেহালা চৌরাস্তার কাছেই শ্রী-দের বাড়ি।

শ্রী-র ব্যবহারে আমার অবাক লাগছে। মেয়েটাকে বললাম, দাদার অমন হয়েছে, তবু একবারও দেখতে গেল না! আরে বাবা, রাগ হয়েছে বুঝলাম। কিন্তু তা বলে এত রাগ! মানুষের এমন অবস্থায় রাগ করে কেউ! ভেবেছিলাম যে, একবার ফোন করি। তারপর আর ফোন করিনি। হঠাৎ গিয়ে দেখব, কী বলে শ্রী। দাদা তো খারাপ কাজ করেছেই। কিন্তু শ্রী নিজে কী করল?

ওদের বাড়িতে পৌঁছোতে আরও কিছুক্ষণ লাগল। বাড়িটা একটা গলির ভিতরে। সামনে বড় পুকুর আছে একটা। বাড়িটা বেশ বড়। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বোগেনভেলিয়ার ঝোপ দিয়ে গেটটা প্রায় ঢাকা। গেট খুলে বাড়ির ভিতরে এসে বাইকটাকে স্ট্যান্ড করলাম। বাগানে অনেক ফুল ফুটে আছে। গোটা বাড়িটাকেও কেমন যেন নিঃঝুম লাগছে। দুপুর বলেই হয়তো।

আমায় দেখে একটি কাজের মেয়ে এগিয়ে এল। আমি একে চিনি। এবাড়িতে দীর্ঘদিন আছে। মিনতিদি।

"আরে ছোটদা!" মিনতিদি হাসল।

"শ্রী আছে?"

"আছে। তুমি জানো না কিছু?" মিনতিদির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল হঠাৎ।

"কী জানব?" আমি ঘাবড়ে গেলাম।

মিনতিদি চুপ করে রইল। তারপর বলল, "তুমি উপরে যাও। বউদি, শ্রী সবাই আছে।"

আমি মিনতিদির মুখ দেখে বুঝলাম যে, এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যাবে না। ফলে আর সময় নষ্ট না করে জুতোটা খুলে লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠে গেলাম। লম্বা দালানের মেঝেটা ঠান্ডা হয়ে আছে। লাল মেঝের চারিপাশে কালো মোটা করে বর্ডার দেওয়া। এই প্যাসেজের একদম শেষপ্রান্তের ঘরটা শ্রী-র। আগে অনেকবার এসেছি। শ্রী-র ঘরের সামনে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়ালাম। পেটের ভিতরে কেমন যেন

একটা অদ্ভুত ভারশূন্য ফিলিং হচ্ছে! কী দেখব পরদা সরিয়ে?

লম্বা শ্বাস নিলাম একটা, তারপর ডাকলাম, "শ্রী, আছ?"

উত্তরটা এল একটু পরে। শ্রী-র মায়ের গলা, "কে?"

"আমি লালমোহন।"

"ও", গলাটা এগিয়ে এসে পরদা সরাল। কাকিমাকে দেখতে পেলাম।

কাকিমা বলল, "আরে তুমি? এসো, এসো। ভিতরে এসো, লাল।"

কাকিমাকে দেখতে এমনিতে খুব সুন্দর। কিন্তু সেই সৌন্দর্যের উপর কেমন যেন একটা ছায়া পড়ে আছে। ফরসা মানুষটার মুখে কেমন যেন পাঁউরুটি রঙের আস্তরণ! যেন অনেক কষ্ট করে কথা বলছে!

ঘরের ভিতরে ঢুকে বললাম, "তোমার কী হয়েছে গো? এমন শুকনো দেখাচ্ছে?"

"আমার?" কাকিমা ম্লানভাবে হাসল, "নিজেই দেখো," বলে বিছানার দিকে ইঙ্গিত করল।

দু'পা এগিয়ে গিয়ে দেখলাম। বিছানায় চাদরে গা ঢেকে শুয়ে আছে শ্রী! সারা মুখে বসন্তের শুকিয়ে যাওয়া গুটি উঠে যাওয়ার দাগ।

"এ কী হয়েছে?" আঁতকে উঠলাম, "কবে থেকে হল? আমি তো জানি না। তোমরা কেউ আমায় খবর দাওনি কেন?"

শ্রী শুয়ে শুয়ে হাসল, "কী হত খবর দিয়ে? তাতে কি আমার রোগ সেরে যেত?"

"না, তা কেন? কিন্তু তাও খবর তো একটা দিতে হয়!" পাশের চেয়ার টেনে বসলাম।

"তুমি ভেবেছিলে, আমি কেন তোমার দাদাকে দেখতে যাইনি, তাই না?" শ্রী একটা বালিশ খাটের হেডবোর্ডে হেলিয়ে রেখে তাতে পিঠ দিয়ে বসল।

"না, মানে..." আমি হঠাৎ মিথ্যে বলতে পারলাম না। কারণ, শ্রী তো সত্যিটাই বলেছে! আজ তো আমি এসেছিলাম মূলত শ্রী-কে ঝাড়

দিতে! কিন্তু বুঝতে পারিনি যে, ওর এমন অবস্থা! আমার খারাপ লাগল খুব। এমনভাবে কত যে ভুল বোঝাবুঝি ছড়িয়ে থাকে আমাদের জীবনে! কত কিছু যে নষ্ট হয়ে যায়! সত্যি, আজ যদি না আসতাম, তা হলে তো শ্রী-র সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা থেকে যেত!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "দাদা জানে?"

এবার কাকিমা বলল, "আমি তো খবর দিতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু ও না করল। হরিতের নাকি শরীর খারাপ। এসব শুনলে আবার আপসেট হয়ে পড়বে। আমার হয়েছে জ্বালা। এই মেয়ে সারাদিন মুখ ভার করে থাকবে, একা-একা কাঁদবে। আর হরিৎ ওদিকে শরীর খারাপ করে পড়ে আছে। বাড়িতে শ্রী-র বাবার তো কোনও হেলদোল নেই। আর শ্রী-র জেঠুমণি তো সারাদিন হরিৎকে ডিভোর্স দেওয়ার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে। আমার সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কংখলে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে চলে যেতে ইচ্ছে করে। কতদিন বলেছি, যা, হরিতের সঙ্গে যা হয়েছে, মিটিয়ে নে। আমাদের মধ্যে কি কোনওদিন অশান্তি হয়নি? তা বলে এভাবে চলে আসতে হবে? ঘটিবাটি কাছাকাছি থাকলে তো শব্দ হবেই! স্বামীর কিছু দোষ দেখলে কি তাকে ছেড়ে আসতে হয়? এ কি কলেজ জীবন যে, বন্ধুকে পছন্দ হল না বলে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছেদ করে দিলাম! এরা সব বড়ই হয়েছে। পড়াশোনা শিখে হাতে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে নিজেদের সম্মান মাপতে শিখেছে। একচুল এদিক ওদিক হল কী, সব ছেড়ে দেবে। এরা ভালবাসতে শিখল না।"

আমি মাথা নামিয়ে শুনলাম। কাকিমার মুখ লাল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায়। বুঝলাম, ভিতরে ভিতরে কষ্ট পেয়েছে খুব। তাই এমন বলছে। আর কে জানে, কিছুটা হয়তো সত্যি বলছে। আমরা হয়তো প্রেমকে আর ততটা গুরুত্ব দিই না। হয়তো নিজেকে আমরা সবচেয়ে আগে রাখি। কী জানি, কীসব হচ্ছে আশেপাশে!

কাকিমা বলল, "যাক, অনেক কথা বললাম। তুমি কিছু মনে কোরো না। আসলে এদের জন্য চিন্তা হয়। আমাদের তো কেটে গেল যা হোক

করে। এদের সামনে সারাজীবন পড়ে আছে। এত সহজে যদি এরা ভেঙে পড়ে, তা হলে কী হবে? তুমি বসো, আমি চা করে আনছি।"

আমি বাধা দিলাম, "আমি তো চা খাই না কাকিমা। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। আমি জাস্ট শ্রী-র খবর নিতে এসেছিলাম। তা ছাড়া ডিউটিতে আছি। একটা ল্যাবে যেতে হবে। না হলে আবার জব শেডিউল গন্ডগোল হয়ে যাবে। বস রেগে যাবে খুব।"

"এইটুকু সময়ের জন্য এলে? তা তোমার দাদা কেমন আছে?" শ্রী-র গলাটা কেমন যেন দুর্বল শোনাল, "আর বাবা?"

"দাদা আছে একরকম। বাবা গত পরশু অস্ট্রেলিয়া গিয়েছে। ক্যানবেরা।"

শ্রী হাসল একটু, "তুমি এবার বাড়ি ফিরে যাও লাল। আর কী হবে? দেখো, বাবা ঠিক মেনে নেবে মিকিকে। তুমি যে ওকে ভালবাসো, সেটা বাবা বুঝেছে। আমায় তো বলেছিল যে, আর তোমার উপর চাপ দেবে না। তোমার ইচ্ছেটা বাবা বুঝতে পেরেছে। তুমি একবার বাবার সামনে যাও। শুধু শুধু রাগ করে থেকো না।"

বাবা এমন বলেছে? সত্যি বলেছে? কিন্তু কখন বলল? আর বাবা মেনে নেবে মিকিকে? তা নিক, কিন্তু আমি যে আর মানতে পারব না। আমি যে বুঝেছি, মিকি পুরো ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে মন থেকে। আর তার জায়গায় অন্য একটা সমস্যা আর মনখারাপ এসে গুছিয়ে বসেছে।

সেদিন পটাইয়ের ফোনটা পেয়ে আমার তো কোনও কিছু মনে হয়নি বরং কেন যেন খুব বিরক্ত লেগেছিল। লেকে ধরা পড়েছে মিকি? স্যাম, মানে, ওই শমীক না কার সঙ্গে! ছিঃ, ছিঃ! মানুষ আর চারপেয়ে জন্তুতে যখন পার্থক্য থাকে না আর, তখন আমার সবচেয়ে বাজে লাগে! সেদিন ওই খবরটা আমায় বুঝিয়েছিল যে, আমি আসলে মিকি সম্বন্ধে কতটা বিরক্ত! ওইটুকু সময়ের মধ্যেই মিকির সঙ্গে পুরো এপিসোডটা খুব ছেলেমানুষি আর ভুলে ভরা মনে হয়েছে। কেন যে অমন করেছিলাম!

আমার বয়স যেন তিরিশ নয়, যেন তেরো! ইনফ্যাচুয়েশনের এটা কি কোনও বয়স?

পটাই বলেছিল যে, স্যামের বাবা পটাইয়ের কাছে এসেছিল। কারণ, পটাইয়ের উপরমহলে জানাশুনো বিস্তর। তাই যদি সাহায্য করতে পারে। কারণ, এসব কেসে পুলিশ ইচ্ছে করলে জল অনেক দূর গড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। পটাই সাহায্য করেওছিল। ওদের ছাড়াতে সাহায্য করেছিল। আর আমায় ফোনে চাপা গলায় বলেছিল, "বাদ দে, এখন তোকে মিকির সঙ্গে কথা বলতে হবে না। তুই আমার বন্ধু নোস আর। তোর সঙ্গে মিকির ব্রেকআপ হয়ে গিয়েছে সেটাও বলিসনি। আর আমি দিনের পর দিন নিজের সব গোপন কথা তোকে বলে গিয়েছি! বন্ধুত্ব মানে কিন্তু শেয়ারিংও লাল। আর এর পরও তুই জেদ করে বাড়ির বাইরে আছিস? তুই মানুষ নোস। মানুষের মতো দেখতে হলেই কিন্তু মানুষ হয় না। মানুষ হয়ে উঠতে হয়। নিজের ইগোটাই তোর কাছে বড়। সেলফিশ!"

ফোনটার কথা আমার কানে ঠিকমতো ঢুকছিল না। কারণ, আমার দিকে ঠায় তাকিয়ে ছিল অণু। আমি বুঝতে পারছিলাম না, কাকে কী বলব! পটাইকে কিছু বলব, না অণুকে কিছু বলব! পটাইকে কিছু বলতে গেলে সময় লাগবে আর বারবার মিকির নাম নিতে হবে। আর অণুর চোখের যা ভাষা, তাতে তো বোঝাতে গেলেই উলটে চাপ হয়ে যাবে!

ফোনটা রাখতেই নিলয় জিজ্ঞেস করেছিল, "কী ব্যাপার? কোনও সিরিয়াস ফোন কি? কোনও বিপদ হয়েছে? আমায় বলতে পারো। আমার এক কাকা মন্ত্রীর পি এ। সব এক নিমেষে সল্‌ভ করে দেবে।"

অণু আমার চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে নিলয়ের উদ্দেশে বলেছিল, "লালমোহনের গার্লফ্রেন্ড সংক্রান্ত ফোন। ওর লাভারের বোধহয় কিছু হয়েছে। দেখছ না, কেমন মুখের কালার চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে! বাই দ্য ওয়ে, তোমরা দু'জন এনজয় করো। আমায় যেতে হবে। একটা আর্জেন্ট কাজ পড়ে গিয়েছে।"

"মানে?" নিলয় তিড়িং করে লাফিয়ে উঠেছিল, "চলে যাবে মানে? ডিনারের কী হবে?"

"তোমরা খাও। সরি, আই কান্ট ওয়েট!" অণু আর কোনও কথা বলতে দেয়নি। ব্যাগটা তুলে হনহন করে হাঁটা লাগিয়েছিল দরজার দিকে।

নিলয় হাঁদার মতো বসে পড়েছিল আবার। ওর মুখ দেখে মনে হয়েছিল, খুব কঠিন কোনও আর্ট ফিল্মের শো-এ ঢুকে পড়েছে। একবর্ণও বুঝতে পারছে না! কিন্তু এমন ভাব করতে হচ্ছে যেন, সবই তো বোঝা হয়ে গিয়েছে!

আমি অণুর পিছন পিছন দৌড়েছিলাম। ফুটপাথে ওর হাতটা ধরে থামানোর চেষ্টা করেছিলাম, "কী হল, তুমি চলে যাচ্ছ কেন?"

অণু এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল, "এভাবে আমায় আটকানোর মানে কী?"

"সরি, সরি!" কী করব বুঝতে পারছিলাম না। অণুর হাত ছাড়ানো দেখে আশেপাশের লোকজন আমার দিকে তাকাতে শুরু করেছিল। বলেছিলাম, "তুমি রাগ কোরো না অণু। আমার কথাটা শোনো। আসলে কী হয়েছে..."

"মাছধরার গল্প বলবে তো আবার? আর ফ্র্যাঙ্কলি, আমি শুনে কী করব? আমার ইন্টারেস্ট থাকবে কেন? তোমার যা খুশি, তুমি করতেই পারো। আমায় বলছ কেন?"

"অণু, পটাই ফোন করেছিল। তুমি পুরোটা শোনো প্লিজ।"

"কেন শুনব? কীসের জন্য শুনতে হবে আমায়? আর তুমিই বা বলতে চাইছ কেন? আমি না শুনলে তোমার কী হবে?" অণু ঝাঁকানো সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের মতো ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছিল, "আমার মিথ্যে শুনতে ভাল লাগে না লালমোহন। বাই।"

আমি আর আটকাতে পারিনি অণুকে। দেখেছিলাম, সামনে দাঁড়ানো একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে উঠে নিমেষে অণু হারিয়ে গিয়েছিল ভিড়ে।

আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম পাশে এসে নিলয় বলছে, "সত্যি তোমাদের ব্রেকআপ হয়েছে, না ঢপ? আচ্ছা, সকালে সত্যি তুমি মাছ ধরছিলে, না সেটাও ঢপ?"

অণু সেই থেকে আর কোনও কথা বলছে না আমার সঙ্গে। এক বাড়িতেই থাকি, কিন্তু তবু দেখাই হচ্ছে না আজকাল। কী যে করব, বুঝতে পারছি না। কেন যে অণু এমন করছে! আর আমিই বা কেন এমন করছি? X এখনও আননোন হয়ে আছে। তবে উত্তর কি দিচ্ছে না? দিচ্ছে, কিন্তু উত্তরটা যেটা বেরোচ্ছে, সেটার দিকে তাকাতে ঠিক ভরসা পাচ্ছি না! সদ্য হাত পুড়েছে আগুনে। আবার কে চকমকি পাথর নিয়ে ঠোকাঠুকি করবে?

"কী চিন্তা করছ লাল?"

শ্রী-র কথায় সংবিৎ ফিরল। বললাম, "নাঃ, এমনি। আসলে সব কেমন যেন ঘেঁটে গিয়েছে! যাই হোক, তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। আমি আসি।"

শ্রী তাকাল আমার দিকে। মুখটা কেমন যেন বিষণ্ণ লাগল। বলল, "আমরা আগে সবাই মিলে কী আনন্দে ছিলাম, না? আর দেখো, সব এখন কেমন হয়ে গিয়েছে!"

"তুমি বাড়ি ফিরে যেয়ো শ্রী। দাদাটা খুব কষ্টে আছে। নিজের ভুলটা বুঝে দগ্ধে দগ্ধে মরছে। যে-ভালবাসায় ক্ষমা নেই, সেই ভালবাসা কি ভালবাসা?"

শ্রী হাসল, "কথাটা বুঝে বললে, না জাস্ট ডায়লগ দিলে লাল? একটু ভেবো তুমিও।"

ভাবলাম বলি, আমি কী জানি! আমায় কি ক্ষমা করেছে কেউ? তারপর ভাবলাম, থাক। আমার মতো অর্বাচীনের হাতে চকমকি সত্যিই মানায় না!

রাস্তায় বেরিয়েই বাইকে স্টার্ট দিলাম না। ভাবলাম, দাদাকে

একবার ফোন করে খবর দিই যে, শ্রী খুব অসুস্থ। আর বলি, ও যেন অতি অবশ্যই এসে একবার দেখা করে শ্রী-র সঙ্গে। আমি নিশ্চিত, দাদা এসে সামনে দাঁড়ালে শ্রী আর মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবে না।

পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে দাদাকে ডায়াল করতে যাব হঠাৎ আমায় চমকে দিয়ে পিকপিক করে বেজে উঠল ফোনটা। কী আশ্চর্য, দাদা ফোন করেছে! টেলিপ্যাথির যে জোর আছে বলতেই হবে! উৎফুল্ল হয়ে ফোনটা ধরলাম, "হ্যালো দাদা, আরে, আমি তোকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম। শোন না..."

"তুই শোন," দাদা আমার উপর গলা তুলে বলল, "সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে লাল, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। লিলুয়ার সাইট থেকে খবর এসেছে যে, আমাদের তৈরি একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক বিশালভাবে ক্র্যাক করেছে! পুরো সিস্টেম বসে গিয়েছে! পার্টি হল্লা করছে খুব। বাবা তো এখন নেই লাল। কী হবে? এ খুব টেঁটিয়া পার্টি। আমাদের বাঁশ করে দেবে! বিশাল ক্ষতিপূরণ চাইবে! আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমি কী করব লাল? কী করব?"

আমার মনে হল, চক হাতে আমি দাঁড়িয়ে আছি বোর্ডের সামনে। সামনে একটা অঙ্ক দেওয়া হয়েছে। সারা ক্লাস তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। কিন্তু আমি কিচ্ছু মনে করতে পারছি না! সব ফর্মুলা ভুলে বসে আছি। শুধু ভয়ে দরদর করে ঘাম হচ্ছে আমার। হাত-পায়ের ঝিঁঝিঁ ডাকছে। সত্যিকারের লালমোহন হলে কী নাম দিতেন এর? 'বেহালায় বেহাল?'

তেরো

দশ লাখ টাকা! একটা ট্যাঙ্কের ক্র্যাকের জন্য দশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ! একটা তো মাত্রা থাকবে গলা কাটার! এ কি মগের মুল্লুক নাকি? যা খুশি, তাই বললেই হল?

দাদার মুখটা এখনও মনে পড়ছে আমার। ভয়ে, টেনশনে সাদা হয়ে গিয়েছিল একদম। বলছিল, "কী কুক্ষণে বল তো আমি ইংরিজির এমএ থেকে এসব ব্যবসায় ঢুকতে গেলাম? বাবা বলল আর আমি অমনি কিছু না বলে চলে এলাম। আমার শালা লাইফটাই এমন! সব ভুল করি। এমন ভুল করলাম যে, শ্রী আমায় ছেড়ে চলে গেল। তুই এই লাইনে কাজ জানিস। কিন্তু কে এক মিকি না চিকি, তার পাল্লায় পড়ে চলে গেলি ব্যাবসা ছেড়ে! বাবাও বিদেশে। আর ঠিক এমন সময়ই এই ঘটনাটা ঘটল! দশ লাখ কমপেনসেশন! ভাব একবার! আর তার সঙ্গে মার্কেটে বদনাম তো ফাউ! কম্পিটিটররা তো বসে আছেই ভুল ধরার জন্য। জানিস লাল, কাল ঘটনাটা হয়েছে আর আজকেই দুটো হয়ে থাকা অর্ডার আটকে দিয়েছে অন্য দুটো পার্টি। খারাপ খবর হাওয়ার আগে দৌড়োয়। এখন কী করব বল তো?"

খবরটা পাওয়ার পরদিনই অফিস ছুটি নিয়ে দাদার কাছে আমাদের অফিসে গিয়েছিলাম। প্রথমে ভিতরে ঢুকতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। লোকজনও কেমন যেন অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছিল। কী ভাবছিল তারা? ভাবছিল যে, আমি আবার ফিরে এসেছি!

দাদা নিজের ঘরেই বসেছিল। আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। আর আমায় দেখতে পেয়েই চিৎকার করে উঠেছিল একদম। দাদা টেনশন করে খুব। সামান্য-সামান্য ব্যাপারেও খুব টেনশন করে। আর এটা তো বড় ব্যাপার। দশ লাখ টাকা দিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তার মানে এটাই যে, আমরা আমাদের ভুলটা মেনে নিলাম? তাতে বাজারে এমন রেপুটেশন হবে, ভবিষ্যতে কাজ পেতে অসুবিধে হবে খুব। ব্যবসায়

আসল তো গুড উইল। সেটা চলে গেলে আর থাকেটা কী?

দাদা আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বলেছিল, "কী রে, চুপ করে আছিস কেন? কী করব বল।"

আমি টেবিলে রাখা পেপারওয়েটটা হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বলেছিলাম, "দ্যাখ, আমি প্রোজেক্টটার প্রথম ফেজে ছিলাম। কিন্তু কাজ যখন হচ্ছিল, তার ফাইনাল ফেজটা দেখিনি। ফলে আমি জানি না, আরসিসি-র কোন গ্রেড বা কোয়ালিটি মেনটেন করেছিস তোরা। ভাবছি, কেন এমন কংক্রিটের ট্যাঙ্কের বটমটা ক্র্যাক করবে? তুই আমায় ডিটেলটা দে। বাবাকে জানিয়েছিস?"

"বাবা তো রেগে গেছে ভীষণ। বলছে, আমি যা পারি যেন করি। তবে একজন কনসালটেন্টের সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। অ্যাড্রেসও দিয়েছেন। বলেছেন, তাঁকে কন্ট্যাক্ট করতে। রিকোয়েস্ট করতে, যদি উনি পার্টির সঙ্গে আমাদের এই নিয়ে যে-টেকনিক্যাল মিটিং হবে, সেটায় যদি আমাদের হয়ে একবার দেখেন। মানে, পার্টি নিজেও একটা বড় কনসালটেন্সি ফার্মকে ডিপ্লয় করছে," দাদা শ্বাস নিয়েছিল একটু, তারপর বলেছিল, "তুই কয়েকদিন ছুটি নিয়ে ব্যাপারটা একটু দ্যাখ না। আমি কী করব, বুঝতে পারছি না। আমাদের যারা ইঞ্জিনিয়ার আছে, তারাও যেন ঠিক ভরসা পাচ্ছে না। আসলে এমন তো কোনওদিন হয়নি।"

"আমি?" দাদার দিকে চিন্তিতমুখে তাকিয়েছিলাম, "কী বলছিস তুই? আমার অফিস নেই? তা ছাড়া জানিস...", আমি থেমেছিলাম একটু, "আমার বস প্যারিস গিয়েছেন। কিছু রেসপনসিবিলিটি আছে আমারও। তা ছাড়া কয়েক মাসের ভিতর আমি হয়তো নিজেও বিদেশে চলে যাব। আর থাকব না এখানে।"

"কী?" দাদা আমার কথাটা বুঝতে সময় নিয়েছিল, "কী বলছিস তুই? চলে যাবি? কেন? কোথায় যাবি?"

আমি বলেছিলাম, "দ্যাখ দাদা, সেটা পরের কথা। তুই আমায়

পেপারগুলো দে। অবসরমতো আমি একবার ডিজাইন দেখে নেব। আর তুই বাবার বলে দেওয়া কনসালটেন্টের সঙ্গে দেখা করে তার হেলপ নে। কারণ পার্টির সঙ্গে মিটিং-এ কিন্তু পার্টি তোকে ছেড়ে কথা বলবে না।"

দাদা আমার দিকে সোজা তাকিয়েছিল, "পালিয়ে যাচ্ছিস লাল?"

"মানে?" অবাক লেগেছিল আমার, "কী বলছিস তুই? আমি পালাব কোথায়? কেনই বা পালাব?"

দাদা আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলেছিল, "জানিস, আমরা খুব সেলফিশ। তুই, আমি, সবাই খুব সেলফিশ। ভাব একবার, বাবা কী অবস্থার মধ্যে এমন একটা ব্যাবসা শুরু করেছিল। মা আর বাবা তখন কত কষ্ট করেছে! আজ আমাদের এই কোম্পানিকে এই জায়গায় আনতে, এই যে দশ-পনেরো কোটি টাকার ব্যাবসা আমরা এখন করি, সেই জায়গায় আনতে, বাবার কত কষ্ট হয়েছে বল! তবু আমাদের মানুষ করায় কোনও খামতি রাখেনি। দোষ যদি বলিস, তবে বাবা চেয়েছে আমরা যেন বাবার মতে যেটা ভাল, সেভাবে জীবন কাটাই। কী আছে বল বাবার? মা মারা গেল। সারাজীবন মাথা গুঁজে কাজ করে কাটাল লোকটা। আমি এমন একটা অপদার্থ হলাম। আর তুই নিজের মর্জিতে সারাজীবন কাটিয়ে দিলি। সামান্য একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলি! তুই কি ভেবেছিস, বাবার কষ্ট হয়নি? ভীষণ হয়েছে। তুই চলে যাওয়ার পর বাবা আর খাবার টেবিলে বসে খায় না। নিজের ঘরে বসে খায়। আমি জানি, বাবার সমস্ত কথা আমি শুনে চললেও বাবা তার অবাধ্য স্বার্থপর ছোট ছেলেটাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। তুই উলটোটা ভাবিস, জানি। কিন্তু তোকেই বেশি ভালবাসে বাবা। তাই তুই যা করতে চেয়েছিস, তাতে কোনওদিন জোর করে বাধা দেয়নি। আমার মনে আছে, যখন ছোট ছিলাম, আমি আধোঘুমে দেখতাম, রাত করে ফেরা বাবা তোর ছোট্ট মুখটার দিকে কী অপলক তাকিয়ে থাকত! তোর ঘুমন্ত ছোট্ট হাতের মুঠো দুটো নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে ভরে

বসে থাকত। তাই আমার কষ্ট হত। মনে হত, আমাকেও বাবা অমন করে ভালবাসুক। তাই আমি বাবার সব কথা শুনতাম। সব নির্দেশ মেনে চলতাম। ভাবতাম, বাবা আমাকেও তবে তোর মতো করে ভালবাসবে! এসব করতে করতে কখন জানি আমি আর আমার রইলাম না! কেমন যেন হারিয়ে ফেললাম নিজেকে! আর তুই তোর জেদ আর গোঁয়ারতুমি নিয়ে সরে গেলি বাবার কাছ থেকে। সেদিন থেকে তুই আর বাবা একা! ভালবাসা বোঝ লাল। কে তোকে ভালবাসে, সেটা বোঝ। সবাই যে মুখে বলবে, তা কিন্তু নয়। কারণ, সবাই তো বলতে পারে না। কিন্তু তা বলে কি আমরা বুঝব না? আমাদের তো বোঝা উচিত! তুই আমাদের এই বিপদে আমাদের সঙ্গে থাকবি না, ঠিক আছে। কিন্তু দেশ ছেড়ে চলে যাস না। কষ্ট হবে আমার, বাবার। বুঝেছিস?"

কোনও কথা না বলে চুপ করে বসে ছিলাম। কী বলব? শ্রী বলে, বাবা আমায় ভালবাসে। দাদা বলে, বাবা আমায় ভালবাসে! কিন্তু আমি ঠিক বুঝি না কেন? আমি কি অন্ধ? না সত্যিই আমি আমার সুবিধেমতো সব সম্পর্ক দেখি? স্বার্থপর... আমি কি তবে সত্যি স্বার্থপর? আমি কি তবে আমার কষ্টটাই শুধু বুঝি? শুধু কি আমার ইচ্ছেটাকেই গুরুত্ব দিই? আমি কি সম্পর্ককে কেবল শিকলের মতো করে দেখি? আমার কাছে কি এর অন্য মানে নেই? আমি ইনসেনসিটিভ? হেডোনিস্ট? কী বলব, বুঝতে পারছিলাম না। দাদা এমন করে তো কোনওদিন বলেনি! তবে এখন এসব কোথা থেকে বলছে ও? কোথা থেকে শিখছে? অবাক হয়ে দাদার দিকে তাকিয়েছিলাম। না, রাগ হচ্ছিল না আমার। বরং অন্য একটা আলো দেখছিলাম দাদার চোখেমুখে, যার আভা এসে পড়ছিল আমার জীবনেও!

দাদা উঠে ঘর থেকে বেরোনোর আগে বলেছিল, "আমি শ্রী-র সঙ্গে অন্যায় করেছি লাল। তার শাস্তি পাচ্ছি। আরও হয়তো পেতে হবে। কিন্তু এই ক'টা খারাপ দিন আমায় একটা কথা শিখিয়েছে। অনর্থক জটিলতা, অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর নিজের জীবনকে পাঁচিল দিয়ে

ঘিরে দিলে আর বাঁচা যায় না। জীবন তো সবাইকে নিয়ে বাঁচারই নাম। এভাবে "একা হয়ে গিয়ে আমি ঠিক আছি" ভেবে বাঁচার জন্য কিন্তু আমাদের জন্ম হয়নি। যাক, প্রচুর জ্ঞান দিলাম। আমি হজমি আর ডিজাইনের ফাইলটা নিয়ে আসছি।"

দাদা কোনওদিনই হিউমারাস নয়। আজও শেষে একটু ইয়ারকি মারতে চেয়েছিল। হয়তো এতটা কথা কোনওদিন একসঙ্গে বলেনি বলে ওর নিজেরই অস্বস্তি হয়েছিল। কিন্তু দাদা ফাইলটা আনতে বেরিয়ে যাওয়ার পরে, ওই একা ঘরে বসে আমার একটা অদ্ভুত মন কেমন করা ভাব এসেছিল। কোথায় যেন মনে হয়েছিল, মায়ের মৃত্যুর পরে যে-অন্ধকার টানেলটাকে আমি দেখতে পেতাম, যেটা থেকে আমি নিজেই বেরিয়ে এসেছিলাম, সেটার দিকে আমি নিজেই হেঁটে যাচ্ছি একা। মনে হচ্ছিল, হয়তো সেই সময় এসেছে, যেখানে আমার জন্য কে কী করেছে, সেটার হিসেব না নিয়ে আমি অন্যের জন্য কী করতে পেরেছি, সেটা দেখার সময় এসেছে।

দাদা সবুজ ফাইলটা নিয়ে আসার পর বলেছিলাম, "তুই বাবার দেওয়া ওই কনসালট্যান্টের নম্বর আর অ্যাড্রেসটা দে। আমি দেখা করে নেব। আর এর ভিতর শুধু আমায় বলিস, কবে ওই ক্লায়েন্ট এই পেনাল্টিটা নিয়ে মিটিং-এ বসতে চায়।"

দাদা হেসেছিল, "আমি কি তোকে প্রেশার দিলাম?"

"দিলে দিয়েছিস। আমাকেই তো দিয়েছিস। প্রবলেম কী? ফালতু এই নিয়ে চিন্তা করিস না। যাকে নিয়ে চিন্তা করার, তাকে নিয়ে কর। শ্রী-র পক্স হয়েছে। পারলে ওকে একবার দেখে আসিস।"

"অ্যাঁ?" দাদার সেই স্মার্টনেস আবার উবে গিয়েছিল নিমেষে, "শ্রী-র শরীর খারাপ? আমি কী করব?"

ফাইলটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, "যাবি, হাত ধরবি তারপর হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে আসবি। এটা পারবি না? আমি তো আর পরস্ত্রীকে টানতে টানতে নিয়ে আসতে বলছি না!"

তারপর থেকে দু'দিন কেটে গিয়েছে। দাদা আমায় ফোন করে জানিয়েছিল যে, মিটিং ফিক্স হয়েছে সামনের বুধবার। তারপর বলেছিল আসল কথাটা, যেটা শুনে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল একদম। দাদা বলেছিল, "জানিস, লিলুয়ার ওরা কোন কনসালটেন্টকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন আমাদের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য? বরেন চ্যাটার্জি, মানে শ্রী-র জেঠু। এবার আমরা নির্ঘাত শেষ হয়ে যাব! আর কোনও উপায় নেই। নাক-কান কেটে উনি রাস্তায় ঘোরাবেন আমাদের!"

আমিও জানতাম, তাই হবে! আমি যে কলেজ স্ট্রিটে দেখা হওয়ার সেই ঘটনাটা ভুলিনি। আমায় যেভাবে অবজ্ঞা করেছিলেন! আর তার উপর শ্রী-র ব্যাপারটা তো আছেই। গায়ের যত ঝাল আছে, তা জেঠু তো আমাদের ওপরই ঝাড়বেন!

দাদা বলেছিল, "লাল, বাবা যে-কনসালটেন্টের নাম বলেছেন, মিস শৈবালিনী জোয়ারদার, তাঁর সঙ্গে কিন্তু দেখা করে তাঁকে রাজি করাতেই হবে। না হলে কী বড় কেস খাব বুঝতে পারছিস তো?"

পরশু বুধবার, মিটিং। আর আজ আমায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন মিস জোয়ারদার। এখন সেখানে এসেই বসে আছি আর মোবাইলে সময় দেখছি। ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে মোটেই রাজি হচ্ছিলেন না। বাবার কথা শুনেও হচ্ছিলেন না। কারণ, উনি নাকি ওভার লোডেড উইথ ওয়র্ক! তাই আর ওঁর পক্ষে কাজ নেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমাদের যা কাজ, তা নাকি ওঁর লেভেলের নয়। কাকুতিমিনতি করে রাজি করিয়েছি ওঁকে। মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছেন। এরপর নাকি ওঁর এক জায়গায় যাওয়ার আছে।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা বাজে। আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে এসেছি। পাঁচটায় ডাকার কথা ছিল মিস জোয়ারদারের, কিন্তু এখনও ডাকেননি। রাগে আমার ব্রহ্মতালু জ্বলে যাচ্ছে। কে আছে ভিতরে যে, আমায় এতক্ষণ ওয়েট করতে হচ্ছে! বুক পকেট থেকে ফোনটা

পিকপিক করে ডেকে উঠল। আবার কে? বিরক্ত হয়ে ফোনটা বের করলাম। পটাই। এর আবার দরকার কী! আমি জানি, এখন ফোনটা ধরলে ও প্রচুর কথা বলবে। তাই আর ধরলাম না। সাইলেন্ট করে দিলাম ফোনটা।

এই নম্বরটা নতুন নিয়েছি। আগে যে-সার্ভিস প্রোভাইডারের ফোন ব্যবহার করতাম, তাদের কানেকশনটা ভাল কাজ করছিল না। এদেরটা ভালই কাজ করছে। পটাই নতুন নম্বরটা পেয়ে বলেছিল, "এই ঠিক নম্বর নিয়েছিস। আমারও এই কোম্পানির কানেকশন। এবার চুটিয়ে আড্ডা দেব তোর সঙ্গে।"

ব্যাটাকে কোনও বিশ্বাস নেই। সত্যি মাঝে মাঝে অড টাইমে ফোন করে হাবিজাবি বকে! কী করে যে কাজ করে, কে জানে!

আবার ফোনটা বাজল। আবার পটাই! আচ্ছা ছেলে তো! ফোনটা ধরলাম এবার, না হলে মাথা খেয়ে নেবে, "পটাই পরে কথা বলব, এখন খুব ব্যস্ত!" কথাটা বলেই নিজেকে কেমন যেন নিলয় মনে হল!

পটাই হাসল, "আমিও কিঞ্চিৎ ব্যস্তই আছি, তবে মিকির জ্বালায় ফোন করতে বাধ্য হলাম।"

"মিকি?" আমার মুখটা হঠাৎ তেতো হয়ে গেল, "সে কেন ফোন করছে তোকে?"

"সে?" হাসল পটাই, "ভাববাচ্যে ডায়ালগ ছাড়ছ যে চাঁদু! এ কি রাগ, না বিরক্তি!"

আমার সত্যিই বিরক্তি লাগল।

"শোন, তোর সঙ্গে ও দেখা করতে চায়। ওকে তোর সেল নাম্বার দেব? নতুনটা তো ওর কাছে নেই!" পটাইয়ের গলায় আর ইয়ারকি দেখলাম না।

"একদম দিবি না। একদম না। শি ইজ ব্যাড নিউজ। জাস্ট কিপ মাই নাম্বার আওয়ে ফ্রম হার।"

"ও কে!" পটাই হাসল, "মনের ভিতর কী করে এমন চেঞ্জ হল

তোর? তবে ভাল, ভালর দিকেই চেঞ্জ হয়েছে। এটা গুড সাইন। এসব মলিকিউলার চেঞ্জ...”

পটাইকে কথা শেষ না করতে দিয়ে বললাম, “পরে কথা বলব। আমায় এবার যেতে হবে।”

সামনের চেম্বারের দরজা খুলে গিয়েছে। ফোনটা কেটে তিড়িং করে উঠে দাঁড়ালাম। আরে, মিস জোয়ারদার যে বেরিয়ে যাচ্ছেন! যেখানে বসেছিলাম, সেখানে নানা ফোটোগ্রাফ বাঁধানো আছে, তলায় নাম লেখা। সেখান থেকেই ভদ্রমহিলাকে চিনেছি। কিন্তু উনি যাচ্ছেন কোথায়? আমার যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল! কোনও ভদ্রমহিলাকে এতটা দ্রুত আমি কোনওদিন হাঁটতে দেখিনি। উনি চেম্বার থেকে বেরিয়ে দ্রুত ওয়েটিং জোনটা পেরিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি তড়িঘড়ি করে পিছনে “ম্যাডাম, ম্যাডাম” করে ছুট লাগালাম। আশ্চর্য মহিলা তো! ভুলেই গিয়েছেন যে, আমি বসে আছি!

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে উনি পিছন ঘুরলেন, “কী ব্যাপার, এমন মাছের বাজারের মতো চেঁচাচ্ছ কেন?”

ওরে বাবা! এ যে দজ্জাল মহিলা! এমন মুখ ঝামটা দিচ্ছেন, যেন আমি ধূপকাঠি গছানোর জন্য ডাকছি। বললাম, “ম্যাডাম, আমি লালমোহন কাঞ্জিলাল। কাঞ্জিলাল কোম্পানি থেকে এসেছিলাম। আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন।”

“অ!” মিস জোয়ারদার এমন মুখ করলেন যে, বুঝলাম ব্যাপারটা মোটেই ওঁর মনঃপূত হয়নি, “আজ হবে না। পরে একদিন এসো। তা ছাড়া বললাম তো, আমার সময় নেই ওসব কেস স্টাডি করে মিটিং করার।”

“ম্যাডাম প্লিজ!” পারলে হাতজোড় করে বসে পড়ব এমন ভয় দেখালাম।

খিটখিটে হলেও এবার আমায় দেখে উনি থমকালেন, “আচ্ছা ছেলে তো? এটা থিয়েটার? ঠিক আছে। তোমার কাগজটা দাও, আমি দেখছি।

কাল একবার ফোন কোরো সেকেন্ড হাফে। তবে যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। অন্য কাউকে খোঁজো।"

আমার হাত থেকে ফাইলটা কেড়ে নিয়ে হঠাৎ আমার পিছন দিকে তাকিয়ে সেকেন্ডের ভিতরে পালটে গেলেন মিস জোয়ারদার। খিটখিটে থেকে একদম টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন। বললেন, "ফোনে বললি এসে গিয়েছিস আর লিফটে করে উঠতে এত সময় লাগল!"

"সরি, একটা ফোন এসেছিল তাই..."

কথাটা কানে যেতেই আমি ছ্যাঁকা খাওয়া বিড়ালের মতো চমকে উঠলাম! কার গলা এটা? কী করছে এখানে ও? পিছন ফিরে দেখলাম সাদা চুড়িদার আর নীল ওড়না নিয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অণু! কতদিন পর তোমায় আমি দেখলাম অণু? আমার বুকের ভিতর দিয়ে আচমকা সাঁ করে চলে গেল সাইলেন্সার ভাঙা একটা মোটরবাইক!

অণুর চোখে খসে পড়ল আমার চোখ, যেন শান্ত জলে খসে পড়ল লাল ফল। আর তার অভিঘাতে ঢেউ খেলল জলে। ভুরু কুঁচকে গেল অণুর। আমি দেখলাম, অণুর টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনটা এবার নিমেষে পালটে মাথাধরার ট্যাবলেটের বিজ্ঞাপন হয়ে গেল!

"তুমি?" আমার ভিতর থেকে আর একটা আমি বলে উঠলাম।

অণুর মুখটা কেমন যেন শান্ত আর স্থির হয়ে গেল আবার। তারপর মিস জোয়ারদারের দিকে তাকিয়ে বলল, "চলো শেলীপিসি। উই আর গেটিং লেট।"

ওরা চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। লিফ্‌টের চকচকে বন্ধ দরজায় আমার ট্যাঁরাব্যাঁকা প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে! এই তো দেখা যাচ্ছে আমায়। তা হলে অণু এমন করল কেন, যেন আমি স্বচ্ছ কাচের তৈরি! আমার কষ্ট হল হঠাৎ। কী করেছি আমি যে, অণু এমন করছে! ওর টলটলে চোখদুটো আমার মনে ভেসে রইল, ভেসেই রইল। মনে হল, আমিই বা এমন করছি কেন? ব্যাপারটা কী? আমার কি প্যারিস যাওয়ার ইচ্ছে নেই?

অলৌকিক বলে কি কিছু হয় পৃথিবীতে? মানে ধরো, এমন কিছু ঘটল, যা কেউ ভাবতেই পারে না? কারও সাধারণ লজিকে যার কোনও কার্য-কারণ বোঝাই যায় না, তাকেই কি অলৌকিক বলে? নাকি কেউ যা আশা করে না, সেটা যখন ঘটে যায়, তখনই তাকে অলৌকিক বলে? আমি জানি না। আধ্যাত্মিকতা আমার পোষায় না। টিভিতে ওই চ্যানেলগুলো আমি জন্মে খুলে দেখি না! ভগবান সম্বন্ধে আমার ভয় বা ভরসা কিছুই নেই। আমি বুঝি, আমার দু'হাতেই আমার পৃথিবী। সেখানে চেষ্টাটা করতে হবে সর্বোচ্চভাবে। বাকিটা যা হয়।

কিন্তু গত কয়েক মাসে হঠাৎ পেকে ওঠা গিঁটটা যে এমনভাবে আচমকা খুলে যাবে, আমি বুঝতে পারিনি! বা বলা ভাল, ধারণাই করতে পারিনি! প্রথম গিঁটটা খুলেছে অবশ্য দাদা নিজেই। আমার সঙ্গে সেই কথা হওয়ার পরের মঙ্গলবার, মানে মিটিংটার আগের দিন বিকেলে হঠাৎ আমায় ফোন করেছিল। আমি তখন সদ্য একটা কাজ সেরে কিছু খাব বলে বাইরে বেরিয়েছি। ফোনটা পিকপিক করায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে কলটা রিসিভ করেছিলাম। দাদার গলাটা কেমন যেন কাঁপছিল। যেন খুব টেনশনে আছে মানুষটা, এমন মনে হচ্ছিল। কী হয়েছে রে বাবা! আমি ভয় পেয়েছিলাম। যা সোনার সময় যাচ্ছে! বলা তো যায় না, কখন কী হয়! একে তো মিস জোয়ারদার আমার ফোন আর রিসিভ করছিলেন না। বুঝতে পারছিলাম যে, আমার কাছ থেকে ফাইলটা নাম কা ওয়াস্তে নিয়েছিলেন। আর এত শর্ট টাইমে অন্য কাউকে আমি জোগাড়ও করতে পারিনি। তাই ভেবেছিলাম, পরের দিন অফিস কামাই করে আমিই না হয় মিটিংটায় গিয়ে বসব। তাই ফোনটা পেয়ে ভেবেছিলাম, দাদা বোধহয় এই নিয়ে কথা বলার জন্যই ফোন করেছে।

দাদা বলেছিল, "লাল, যখন সব দরজা বন্ধ হয়ে যায় তখন কী করতে হয় বল তো?"

"অ্যাঁ?" আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, দাদা কি এই জন্য টেনশন করছে? জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কী রে বাথরুমে লক হয়ে গিয়েছিস নাকি? দরজা খুলতে পারছিস না?"

"লাল!" দাদা যেন একটু বিরক্ত হয়েছিল, "একটা প্রশ্ন করছি আর তুই ফালতু কথা বলছিস! জাস্ট অ্যাজিউম কর যে, তোর জীবনের সব দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন তুই কী করবি?"

"আমি কী করব?" ফোনটা কানে ধরে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। সত্যি, কী করব আমি? আসলে এসব ফিলজফি, ইংরিজির লোক হয়ে দাদা করতে পারে। ওদের কত কঠিন কঠিন জিনিস পড়তে হয়েছে। চুলের চামড়া ছাড়াতে হয়েছে! সেখানে আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। চুন, বালি, সিমেন্টের মানুষ। অত বুঝি না। সিম্পলভাবে জীবনকে দেখি, বড় বড় মানুষের মতো জীবনবোধ আমার একদম নেই। সেখানে দাদার এই প্রশ্নটা শুনে মনে হয়েছিল, একটা বককে থালায় খেতে দিয়েছে!

"কী রে, বল?" দাদা এমন করে জিজ্ঞেস করেছিল যেন ওর সামনে অমিতাভ বচ্চন বসে রয়েছে আর ওর তিরিশ সেকেন্ড সময়টা চলে যাচ্ছে দ্রুত!

"আমি? কী আর করতাম, লাথি দিয়ে ভাঙতাম বন্ধ দরজাগুলো। এ ছাড়া তো আর কোনও উপায় নেই।"

"ঠিক বলেছিস," দাদা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, "আমিও লাথি দিয়েই ভাঙব!"

আমি বুঝতে পারিনি দাদা কী ভাঙার কথা বলছে। তবে বড় সড় কিছু নিশ্চয়ই। না হলে দাদার মতো মানুষ এমন হিংস্র হয়ে উঠত না! বলেছিলাম, "কেসটা কী বল তো?"

দাদা গম্ভীর গলায় বলেছিল, "আজ সন্ধেবেলা আমি বেহালায় গিয়ে জোর করে শ্রীকে তুলে নিয়ে আসব। মামদোবাজি পেয়েছে ও? জানিস, এখনও ফোন ধরছে না! আজ একটা হেস্তনেস্ত হবে!"

কী বলব বুঝতে না পেরে বলেছিলাম, "যাই করিস, সাবধানে।

কাল মিটিং আছে। বুরুজেঠু আছেন ওখানে। জানিস তো, ওঁর কেমন মেজাজ।"

"আমার বউকে আমি নিয়ে আসব, তাতে কার বাপের কী? তবে..." দাদার ওই হাই-পিচ গলার স্বর কেমন যেন লো পিচ হয়ে গিয়েছিল শেষের দিকটায়।

"তবে কী রে?" আমি মুড়ির একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

"তবে তুই যাবি আমার সঙ্গে?"

"আমি? না রে দাদা," সরাসরি বলেছিলাম, "কী করব বল? আজ পোদ্দারসাহেব আছেন এখানে। ছুটি দেবে না। প্লাস, কাল যদি যেতে হয় তো আজ তাড়াতাড়ি বেরোলে হবে না। প্লাস আমার আজ মোটরবাইকটাও নেই। খারাপ হয়ে গিয়েছে। ফলে বেস্ট অফ লাক।"

দাদা একটু চুপ করে গিয়েছিল, তারপর নিজের বুকের ভিতরের সাহসের বেলুনটা ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে টেনস্‌ড গলায় বলেছিল, "যা হয়, হবে। আমি একাই যাব। জয়কালী!"

দাদা ফোন রেখে দেওয়ার পরে মুড়ি কিনে খেতে খেতে মনে হয়েছিল, দাদা তো 'জয়কালী' বলল, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আবার চুনকালি মাখবে না তো মুখে! তার উপর আবার বুরুজেঠু সন্ধেবেলা বাড়িতেই থাকেন! কাল আমাদের বিরুদ্ধে উনি বসছেন লিলুয়ার পার্টির হয়ে। জানি না, দাদাকে আজই এসব কেন করতে হল! কাল যে কী নাচছে কপালে, ভগবান জানে!

কাজকম্মো শেষ করে বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম। কাকু-কাকিমার সঙ্গে বেশি কথাই বলিনি। আর অণু তো আজকাল কথা বলে না। তাই সেই পাটও নেই। খেয়ে দেয়ে আমি ওই ফাইলটা নিয়ে বসেছিলাম। কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, কেন ক্র্যাকটা হল। কারণ, সবকিছুই ঠিক আছে। ডিজাইনের সেফটি ফ্যাক্টরও ঠিক আছে। এমনকী, খবর নিয়ে জেনেছি যে, যা মালপত্র ব্যবহার করা হয়েছিল, মানে, সিমেন্ট-

বালি ইত্যাদি সেখানেও কোনও ভেজাল দেওয়া হয়নি। তবে কেন যে এমন হল, কে জানে! বুঝতে পারছিলাম না মিটিং-এ গিয়ে আদৌ কী বলব আমি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, বুরুজেঠু তন্দুরি চিকেন খাওয়ার মতো করে আমায় চিবোচ্ছে!

ফাইলটা সবে বন্ধ করেছি, ঠিক তখনই পিকপিক করে আমার ফোনটা ডেকে উঠেছিল। নম্বরটা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মিস জোয়ারদার! রাত সাড়ে দশটার সময় উনি আমায় ফোন করছেন!

"হ্যাঁ ম্যাডাম," টেনশন হচ্ছিল খুব। কী বলতে চান উনি?

"কাল ক'টার সময় মিটিং?" মিস জোয়ারদার জোরদার গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন।

"কাল? ইয়ে, মানে, সাড়ে দশটার সময়। ওদের হেড অফিস চৌরঙ্গিতে, সেখানে। কেন ম্যাডাম?"

"কেন মানে?" মিস জোয়ারদার সবসময় এমন রেগে থাকেন কেন, কে জানে! বলেছিলেন, "আমি মশকরা করতে এত রাতে তোমায় ফোন করেছি? আমার অফিসে এসে দশটার সময় পিক আপ কোরো আমাকে। আর সব পেপার্স সঙ্গে রাখবে। উনিশ-বিশ হয়েছে কী, আমি সব ছেড়ে চলে যাব একদম। বুঝেছ?"

এমনভাবে বোঝালে কে না বুঝবে? সব বুঝে গিয়েছিলাম জলের মতো! শুকনো গলায় বলেছিলাম, "থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।"

কোনও উত্তর না দিয়ে উনি কট করে কেটে দিয়েছিলেন ফোনটা।

আমি এক মুহূর্তও দেরি করিনি। দাদাকে ফোন করেছিলাম। তখন একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আজ দাদার সেই লাথি মেরে দরজা ভাঙার প্রোগ্রামটা ঘটানোর কথা! ফোনটায় চারটে রিং হওয়ার পর সেটা হঠাৎ মনে পড়েছিল! কিন্তু কাটতে পারিনি। কারণ, এটাও যে খুব দরকারি!

"হ্যালো?"

রিনরিনে গলার স্বরটা শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম খুব, "শ্রী?" আমার

চোয়াল খুলে প্রায় ড্রপ খাচ্ছিল মাটিতে!

"চলে এলাম," শ্রী-র গলার স্বরে লজ্জা, "তোমার দাদা এমন করল যে..."

শ্রী চলে এসেছে? দাদা কী করেছে যে, শ্রী চলে এল? দাদা কি খুব ঝামেলা করেছে? কিন্তু শ্রী-র গলা শুনে তো বেশ আহ্লাদিত মনে হচ্ছে! আর সত্যি তো, ওর যদি ইচ্ছে না থাকত, তবে কি আর দাদা জোর করে আনতে পারত ওকে? শ্রী কি কারও জোর শোনার মেয়ে? তবু জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুমি... মানে... খুব ভাল! তা শরীর কেমন আছে?"

"শরীর ঠিক আছে। আসলে এখন তো গুটিগুলো শুকিয়ে পড়ে যাচ্ছে। প্রায় সবটাই পড়ে গিয়েছে। শুধু উইক লাগে। আর কিছু না। নাও ধরো, দাদার সঙ্গে কথা বলো।"

আমার তখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। দাদা ফোনে আসার পর আমি বলেছিলাম, "কী রে দাদা? কী কেস?"

দাদা হেসে বলেছিল, "আমি কিছুই বিশেষ করিনি। শুধু গিয়ে শ্রী-র সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ও তাকাচ্ছিলই না। তখন আমার এমন দুঃখ হল যে কেঁদে ফেললাম! ব্যস, শ্রীও দেখলাম মুখ ঘুরিয়ে কাঁদছে। তারপর আমি এগিয়ে গেলাম আর সিনেমায় দেখাল যে, দুটো ফুল নিজেদের মধ্যে মাথা ঠোকাঠুকি করছে! বুঝলি?"

কিছু বলতে গিয়ে হেসে ফেলেছিলাম, "সত্যি মাইরি! তোরা দেখালি কিছু। সত্যিই দেখালি! আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ইন আ গুড ওয়ে, বুঝেছিস? তবে এত সহজে শ্রী চলে এল?"

দাদা একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, "ভালবাসা থাকলে সব হয়। আসলে কী জানিস, আমরা সহজ কথাটা সহজভাবে বলতে পারি না বলে জীবনও সহজ থাকে না। ভালবাসি, সেটা স্পষ্ট করে বোঝালেই হয়! আর বেশি কিছু নাটক করার দরকার পড়ে না।"

কী বলব বুঝতে না পেরে চুপ করে গিয়েছিলাম। আসলে সবকিছু

অত সহজ হয় না তো! মাঝে মাঝে নিজেকে বুঝতেও তো সময় চলে যায়। আর মানুষ যখন নিজেকে বুঝতে পারে, তখন দেখে যে, কোথায় যেন একটা দূরত্ব, একটা সংকোচ, একটা অদৃশ্য দেওয়াল চলে এসেছে! সেটাকে টপকাতে তখন কী যে কষ্ট হয়! আমার ভাল লাগছিল আর সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন একটা কীসের কষ্টও শুরু হয়েছিল! খুব তিরতিরে নদীর স্রোতের মতো একটা কষ্ট! কেন কষ্ট হচ্ছিল আমার? কী ঘুরছিল আমার মধ্যে যে, শূন্য লাগছিল আমার? কোনও না-পাওয়া কি আমায় টানছিল?

দাদা বলেছিল, "তবে একটা সমস্যা হয়েছে। বুরুজেঠু হেভি খচে গিয়েছেন। ভেবেছিলেন, আমায় টাইট দেবেন ভাল করে। কিন্তু শ্রী যে প্ল্যান ভন্ডুল করে দেবে, তা তো বুঝতে পারেননি। আসার সময় বলছিলেন, কাল নাকি দেখে নেবেন আমাদের। জানি না, কী হবে!"

"কী হবে, জানি না। তবে আমরাও বিনা রণে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী। বুঝেছিস? মিস জোয়ারদার রাজি হয়ে গিয়েছেন! কাল সকাল দশটার সময় ওঁকে ওঁর অফিস থেকে পিকআপ করতে হবে। বুঝেছিস?"

"অ্যাঁ?" দাদার অবাক মুখটা ফোনের ওপার থেকেও যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। দাদা বলেছিল, "সে কী রে? তুই কী ম্যাজিক করলি যে, মহিলা রাজি হয়ে গেলেন?"

"জানি না রে! উনি নিজেই ফোন করে বললেন। কী জানি, কী কেস! তবে যাই হোক, আমি কি তা হলে অফিসে গিয়ে ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে যাব ওঁকে পিকআপ করতে?"

দাদা চুপ করে ছিল কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিল, "লাল, ছাড়। আমি যাব। সঙ্গে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা তো থাকবেনই। আমি নিজে ফেস করতে চাই। জানিস, সমস্যা হলে লুকিয়ে থেকে, একে-ওকে ধরে লাভ নেই রে। নিজেকে গিয়ে ফেস করতে হয়। আমাকেই ফেস করতে হবে। তুই তো পরে আর থাকবি না। বিদেশ চলে যাবি। তখন কী হবে? তার

চেয়ে এটাই ভাল। আমি ঠিক চলে যাব। আর তুই অফিসের জন্য যা করেছিস, সেটার জন্য থ্যাঙ্কস।"

"মানে?" আমার খুব অবাক লেগেছিল, "থ্যাঙ্কস মানে? ওটা আমার অফিস নয়?"

দাদা শব্দ করে হেসেছিল। বলেছিল, "পটাই ফোন করেছিল, জানিস? বলল, তোর সঙ্গে নাকি এখন মিকির আর কোনও সম্পর্ক নেই! তবে কেন তুই এখনও বাড়িতে ফিরলি না লাল? বাবা সত্যি চায়, তুই ফিরে আসিস। তুই সত্যি কি আর আমাদের কোনও কিছুকে নিজের ভাবিস না? প্যারিস খুব সুন্দর শহর শুনেছি। কিন্তু জানিস, আমার না কেন জানি না বোকার মতো এই কলকাতাটাকেই বেশি ভাল লাগে। তুই ভাবিস না, আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। বুরুজেঠা কতটা ঢ্যাঁটা আমি দেখব।"

দাদার সেন্স অফ হিউমার কোনওদিনই ভাল নয়, তবু দাদা মজা করতে চায়। চেষ্টা করে যায়। চেষ্টাটার মধ্যে একটা সাহস আছে। সেদিন ফোনটা রেখে বুঝেছিলাম দাদার সাহস ওর মজা করার সীমানা ছাড়িয়ে ক্রমশ ঢুকে পড়ছে অন্য জায়গাতেও।

"শালা এটা কি রাসবিহারী মোড় না পায়জামার গিঁট্টু? জ্যাম লেগেছে তো লেগেইছে! খুলছে না?" পটাই ওর গাড়ির ভিতরে এমন নড়েচড়ে বসল যে, গাড়িটা ডিঙি নৌকোর মতো টাল খেল, "আর শালা তুই এক ক্যালানে! এমন দিনে তুই বুঝতে পারলি তোর মন কী চায়? ন্যাকামো দেখে বাঁচি না শালা, কোরামিন এনে দে!"

আমি মোবাইলে সময় দেখলাম। অলৌকিক আরও কিছু চাই আজ! আটটা কুড়ির কাঞ্চনকন্যা ট্রেনটা শেয়ালদা স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার আগে আমায় যে করেই হোক পৌঁছোতে হবে ওখানে। না হলে, আমার জীবনটা কী যে হয়ে যাবে! অনেকটা ঠিক উত্তমকুমার ছাড়া বাংলা সিনেমা, সচিন ছাড়া ভারতীয় ক্রিকেট আর ফ্রাস্ট্রেশন ছাড়া তোমার

জীবনের মতো হবে। কারণ, ওই ট্রেনটার পেটের ভিতরেই আমার প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে!

পটাই আবার বলল, "তুই শালা নিজের ফিলিংস নিজে বুঝিস না? এমন ফালতু ছেলে মাইরি বাপের জন্মে দেখিনি।"

"এত মুখ খারাপ করছিস কেন? শালাগুলো কমন নিয়ে নে। আর সামনে দ্যাখ। যে-কোনও সময়ে সিগনাল সবুজ হবে।"

"তুই সত্যিই বুঝতে পারিসনি এতদিন? এতদিনে তোর চৈতন্য হল? এই সন্ধে পৌনে আটটার সময় তুই বুঝলি যে, তোর ওকে চাই? সাইকো নাকি তুই?"

আমি কী, আমি নিজেই জানি না। আসলে সব এমন হয়েছিল আমার জীবনে যে, কোনটা কী বুঝতে বুঝতেই সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে! তারপর মিস জোয়ারদার আর নীতীশকাকু যখন বলল, তখন আমি বুঝলাম! মনে হল, আমার ভিতর থেকে কী যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে! মনে হল, এভাবে যেতে দেওয়া কি ঠিক? চোখের সামনে যে-ছিল, তাকে কেন অবহেলা করলাম? মনে পড়ে গেল প্রতিটা ঘটনা। বুঝলাম, আমি অন্ধ, স্বার্থপর আর বোকা, ভীষণ বোকা!

সেদিন মিটিং-এ মিস জোয়ারদার যা সব পয়েন্ট তুলেছিলেন, তাতে নাকি বুরুজেঠু এঁটেই উঠতে পারেননি। বুরুজেঠুর বক্তব্য ছিল যে, আমাদের ডিজাইন ইন-অ্যাডিকোয়েট। ঠিক নয়। তখন মিস জোয়ারদার সকলের সামনে দেখিয়ে দেন যে, ডিজাইন তো ঠিক আছেই, বরং এর সেফটি ফ্যাক্টরও ভাল। তা হলে কেন ক্র্যাক করল ট্যাঙ্ক? কারণ, পার্টি অর্ডার দিয়ে এমন তাড়াহুড়ো করেছিল যে, আমাদের বাধ্য হয়ে পার্টির দেওয়া সয়েল বিয়ারিং-এর রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কনস্ট্রাকশন শুরু করতে হয়। আর সেটাই নাকি ভুল! একটা ডোবা বুজিয়ে সেই জায়গায় কনস্ট্রাকশন করা হয়েছে। সেটা জানানোও হয়নি আমাদের। ফলে যে ফাইলিং দরকার ছিল, সেসবও হয়নি। ব্যস, কংক্রিটের ট্যাঙ্ক বসে গিয়েছে! তার মেঝে ফেটে গিয়েছে! কোন মুখে পার্টি কমপেনসেশন

চায়? বুরুজেঠু আরও কিছু বলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মিস জোয়ারদার এমন জোরদার যুক্তি সাজিয়েছিলেন যে, আর কিছু বলতে পারেননি। তবে এটা ঠিক হয়েছে যে, আমরা রেকটিফিকেশন ড্রইং দেব আর সেই অনুযায়ী কাজও করে দেব। যা এক্সট্রা টাকা লাগবে, সেটা পার্টি দেবে। মিটিং-এর শেষে বুরুজেঠু নাকি দাদার দিকে তাকিয়ে প্রায় চোখ দিয়ে ভস্ম করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন! ভাগ্যিস সত্য যুগ নয়, তাই দাদা এই কথাগুলো আমায় বলার জন্য বেঁচে আছে!

গতকাল মিস জোয়ারদারই রেকটিফিকেশন ডিজাইন করে দিয়েছেন। তাই দাদা বলেছিল, আমি যেন একবার গিয়ে থ্যাঙ্কস জানিয়ে আসি ওঁকে। কারণ, উনি আমাদের মান-ইজ্জত সবই তো রক্ষা করেছেন!

অফিস থেকে আজ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পটাইয়ের অফিসে গিয়েছিলাম। পিপি এখন বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছে। ডেলিভারি অবধি ওখানেই থাকবে। তাই পটাই একা। আর আজ শুক্রবার বলে ও বলেছিল, ওর সঙ্গে ডিনার করতে। অফিসে পটাইয়ের বিশেষ কাজ ছিল না। ওই কী একটা লেখায় ফিনিশিং টাচ দিচ্ছিল। আর বসে বসে কী করব ভেবে ওখান থেকেই ফোন করেছিলাম মিস জোয়ারদারকে।

"আবার কী হল?" ভদ্রমহিলা খ্যাঁক করে উঠেছিলেন ফোন ধরে, "আমি এখন এয়ারপোর্ট যাচ্ছি। খুব ব্যস্ত। তোমাদের কাজ তো করে দিয়েছি। আবার জ্বালাচ্ছ কেন?"

আমি থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। এ তো ভারী বিপদ! ভাল কথা বলতে গিয়েও ঝাড় খাচ্ছি! তাও কোনওমতে ভিড় ট্রেনে ওঠার মতো করে ওঁর রাগী কথার মাঝে আমি মাথা মানে, ইয়ে, কথা গলিয়ে দিয়েছিলাম, "আপনি যা করলেন, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে গিয়ে একটু দেখা করতে চাই। আপনি যদি সময় দেন..."

"ধন্যবাদ? আমায়? পাগল নাকি তুমি?" আবার খ্যাঁক করে উঠেছিলেন উনি, "আমায় ওসব দিচ্ছ কেন? টাকা তো দিয়েছে তোমাদের কোম্পানি। তবে? ধন্যবাদ দিতে হলে দাও অণুকে। ও না

বললে তোমার কাজটা আমি করতাম না। বুঝেছ?"

"অণু?" মনে হয়েছিল, কেউ তির মেরে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল আমায়, "মানে?"

"অণু ঠিকই বলেছিল। এ পুরো হাঁদা গঙ্গারাম! আমি নরেন জোয়ারদারের বোন। ও তোমায় আমার অফিসে দেখেছিল সেদিন। তারপর বলল, আমি যেন কাজটা করে দিই। ধন্যবাদটা ওকে দাও। আর শুধুই ধন্যবাদ দেবে? ঘটে কি কিছু নেই?"

"ঘটে? কার ঘটে?" ঘাবড়ে গিয়ে ছড়িয়ে একসা করেছিলাম। অণু, ঘট, এসব কী বলছেন!

মিস জোয়ারদার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে 'তুই'তে নেমে গিয়েছিলেন, "আরে, তুই কি বোকা? তোর ঘটে কিছু নেই? মেয়েটা কেন কাঁদে তোর জন্য? রাখ ফোন। আমার প্লেন মিস হলে তুই আমায় কাঁধে করে পৌঁছে দিবি লন্ডন?"

ফোনটা রেখে এদিক-ওদিক দেখছিলাম। জিভ শুকিয়ে ব্লটিং পেপার হয়ে গিয়েছিল! কাজটা করার জন্য অণু বলে দিয়েছে? ও তো কথাই বলছে না আমার সঙ্গে! আমায় তো ছেঁড়া কাঁথার মতো ত্যাগ করেছে। তবে? তবে কেন কাঁদছে ও? আমার জন্য? কখন একটা মানুষ অন্য মানুষের জন্য কাঁদে? আবার ফোনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে অণুকে ডায়াল করেছিলাম। ও মা, ফোন সুইচ্‌ড অফ! মনে হচ্ছিল, এটাই হওয়ার ছিল এখন? এটা কোন বিচার হল? ফোন কি শীতকালের পাখা যে, সুইচ অফ করে রাখতে হবে? আমার যে অণুকে খুব দরকার! ওকে যে জিজ্ঞেস করতেই হবে কেন ও কেঁদেছে আমার জন্য! আর... আর একটা কথাও যে বলতে হবে। বলতে হবে, ও এভাবে আমার সঙ্গে কথা না বলে, এড়িয়ে গেলে আর ফোন সুইচ অফ করে রাখলে আমিও ভুলে যাব যে, ছেলেদের কাঁদতে নেই!

উপায় না দেখে নীতীশকাকুকে ল্যান্ড লাইনে ধরেছিলাম।

নীতীশকাকু দু'বার রিং হতেই ধরেছিলেন ফোনটা, "কে? লাল?"

এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "অণু কই কাকু? ওর ফোন অফ কেন?"

"হয়তো ফোনে কারেন্ট অফ হয়েছে!" কাকু কথাটা বলে এমন করে হেসেছিলেন যেন মজার কথায় নোবেল প্রাইজ পেয়ে গিয়েছেন!

ইচ্ছে করছিল ফোনের ভিতরে ঢুকে দু'হাত দিয়ে ওঁর গলা টিপে ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করি, "কোথায় অণু? অণু কোথায়?" কিন্তু তা তো আর করতে পারি না। ভদ্র হওয়ার যে কী জ্বালা! মন খুলে বাঁচাও যায় না! ফলে কাতর গলায় বলেছিলাম, "কাকু প্লিজ, অণু কই?"

কাকু বোধহয় এবার বুঝেছিলেন। নিজের ফানি সাইড নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না করে বলেছিলেন, "ও তো আজ নর্থ বেঙ্গল চলে যাচ্ছে! কাঞ্চনকন্যা ধরবে।"

"অ্যাঁ? আমি জানি না তো?"

"তুমি কী জানো বাবা?" কাকু কেমন যেন ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, "আর শোনো, অণু একটা স্লিপ রেখে গিয়েছে তোমার জন্য।"

"আমার জন্য?" আমি উৎসাহে, উদ্দীপনায় কী করব বুঝতে পারছিলাম না!

"হ্যাঁ। মিকি বলে একটা মেয়ে ফোন করেছিল ল্যান্ডলাইনে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তুমি ওকে আমার বাড়ির ল্যান্ড নাম্বার দিয়েছিলে। তা অণুই ফোনটা ধরেছিল। আমায় বলে গিয়েছে, তোমায় যেন আমি বলে দিই।"

"কী? মিকি?" আমার গলার স্বর মিকিমাউসের মতোই হয়ে গিয়েছিল! এই কপাল আমার! যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই কি সন্ধে হতে হবে? অন্য কোথাও সন্ধেটা হতে নেই? "কিন্তু আমি তো মিকির সঙ্গে কোনও... মানে, আমি তো অণুকে... মানে আমি..."

"বড্ড বেশি 'আমি' হয়ে যাচ্ছে লাল। আর যা বলার, অণুকে বোলো। আমায় বলে কী হবে? ট্রেনটা কিন্তু আটটা কুড়িতে।"

"কোনও মানে আছে বল?" পটাই আমার দিকে না তাকিয়ে নাক

দিয়ে শব্দ করল একটা। জ্যাম ছাড়িয়ে গাড়ি এখন ছুটছে শেয়ালদার দিকে।

মোবাইল বের করে আবার সময় দেখলাম। আটটা বাজে। পটাই তর্ক বাধাতে পারে জেনেও রিস্‌ক নিয়ে বললাম, "তুই মাইরি তোর কমেন্ট আর সমালোচনা তোর পেপারের জন্য তুলে রাখ। আমায় আর বলিস না। এখন চল। আচ্ছা, আজকাল কি ট্রেন রাইট টাইমে ছাড়ে?"

"সেটা আমি কী করে জানব? আমি চেষ্টা করছি। তোকে শালা ক্যালাতে ইচ্ছে করছে! কোথায় ভডকা খাব, না উনি প্রেম জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন। যেন হাতঘড়ি পরতে ভুলে গিয়েছে! তার উপর মিকির ফোন গিয়েছে অণুর কাছে! বাঃ! তোকে কে বলেছিল ও বাড়ির ল্যান্ড লাইনের নাম্বার মিকিকে দিতে? তুই দাতাকর্ণ? সব বলতে হবে মিকিকে? কোন সাইজের জাঙিয়া পরিস, সেটাও বলেছিস?"

"আচ্ছা, আমি একবার শেয়ালদার এনকোয়ারিতে ফোন করে বলব যে, ট্রেনে বোমা রাখা আছে?" আশা নিয়ে তাকালাম পটাইয়ের দিকে।

"ক্যালানি খেতে ইচ্ছে করছে? সারা পৃথিবীর এরকম অবস্থা, আর তাতে এমন ফোন করবি? কেলিয়ে না লাল থেকে নীল করে দেবে! আর এনকোয়ারিতে কেউ ফোন তোলে যে, তুই বলবি? শালা মেয়েটা জলজ্যান্ত যখন সামনে ঘুরল তখন ঘ্যাম দেখিয়ে মরলি! আর এখন হেদিয়ে মরছিস? বলেছিলাম মলিকিউলার কেস। অণু-পরমাণু নিয়ে পেঁয়াজি করিস না। নে শালা, এখন চপের দোকান খোল।"

"পটাই, এবার কিন্তু..." আমি কথা হারিয়ে সামনে মল্লিকবাজারের অথই জ্যামের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মোজেসের মতো যদি এটাকে দু'ভাগ করতে পারতাম! আবার মোবাইল দেখলাম। আর মাত্র দশ মিনিট আছে। পারব? হবে?

পটাইয়েরও টেনশন হচ্ছে, "তোর মোটরবাইকটা খারাপ হওয়ার সময় পেল না? তুই যেমন আতা তোর বাইকটাও আতা! তবে কী জানিস, প্রতিটা লাভ স্টোরিতে এমন একটা দৃশ্য থাকা খুব জরুরি। এই

যে প্রেমিকা মনখারাপ করে চলে যাচ্ছে আর প্রেমিক কাছা খুলে তাকে আটকাতে যাচ্ছে, এটা খুব খায় পাবলিক!"

"আবার তুই ভাট বকছিস? সিগনাল হয়ে গিয়েছে, চল," জানলা দিয়ে বাইরে গলা বাড়িয়ে সামনের গাড়িদের উদ্দেশে চিৎকার করলাম, "ও দাদারা চলুন না। কী হল? চলুন।"

"কেন ভাই?" সামনের গাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক মুখ বাড়িয়ে হাসলেন, "বড়বাইরে পেয়েছে বুঝি?"

ননসেন্স অফ হিউমার! মনে হল, মালটাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ধড়াধ্বড় ক্যালাই! শালা, মাজাকি? অণু চলে যাচ্ছে আর দাঁত ক্যালানো হচ্ছে? আমি মনে মনে অণুর মুখটা দেখতে পেলাম। ওই বড় বড় চোখ। লম্বা দুটো টোল। কোথায় যাচ্ছে অণু আমায় ফেলে? ও কি ভেবেছে মিকির সম্বন্ধে আমি মিথ্যে বলেছি? বলিনি তো। মিকি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে আমি কী করব? আমার দোষ কোথায়? ও কেন ভুল বুঝল? কেন রাগ করল?

শেয়ালদা স্টেশনের সামনে গাড়ি নিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন আটটা একুশ বাজে। আর অপেক্ষা না করে গাড়ির দরজা খুলে লাফিয়ে পড়লাম প্রায়! তারপর দৌড় দিলাম। আর মনে মনে, ভয় বা ভরসা নেই যে-লোকটার উপর, সেই ভগবানকে বললাম, "কোনওদিন কিছু চাইনি। ট্রেনটা জাস্ট পাঁচ মিনিট লেট করিয়ে দাও। ব্যস, মাইরি বলছি, আর কিছু চাইব না কোনওদিন!"

লাল জামা পরা কুলিদের টপকে, সামনের লোকদের গুঁতিয়ে, ডাঁই করে রাখা চটের প্যাকিং বাক্স টপকে আমি দৌড়োতে লাগলাম। ওই তো স্টেশনের সিঁড়ি। ওই তো ডিসপ্লে বোর্ড। ট্রেনের নাম... ট্রেনের নাম... ওই তো! আটটা কুড়ি। কাঞ্চনকন্যা। নাইন বি প্ল্যাটফর্ম। আমি সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়োলাম। আশেপাশের মানুষজন দেখছে। টিটি হতবাক! পুলিশ কী করবে বুঝতে পারছে না। আমি ভিড়ের গালাগাল খেয়ে, অভিশাপ মাথায় নিয়ে নাইন বি-তে ঢুকলাম। এ কী! ট্রেন কই?

প্ল্যাটফর্মে ছানাকাটা ভিড়। ক্লান্ত কুলি, অলস দোকানি আর খিটখিটে ভিখিরিরা ছড়িয়ে আছে। কিন্তু ট্রেন? ট্রেন কই? ওই... ওই তো চলে যাচ্ছে ট্রেন। মন্থর সাপের মতো স্টেশনের ওই মাথায় তার লেজ সরে যাচ্ছে ক্রমে দূরে। শেষ বগির পিছনটা দেখা যাচ্ছে। কালোর উপর হলুদ রঙের ক্রস আঁকা। যেন আমার মুখের উপর সবকিছু কেটে গোল্লা বসিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে... চলে গেল!

চলে গেল অণু? কবে ফিরবে? ওর তো বিয়ের কথা চলছিল। কোন ডাক্তারের সঙ্গে ও দেখা করেছিল না? বিয়ে করতেই কি গেল? আমায় একবারও বলল না কিছু?

আমার বুকের সব হাওয়া বেরিয়ে গিয়েছে। ম্যারাথনে লাস্ট হওয়া মানুষের মতো হাঁপাচ্ছি আমি। কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে খুব। কেমন যেন শূন্য লাগছে সব! ফাঁকা লাগছে। লজিকে বসছে না কিছু। যা আশা করিনি, তাই ঘটে যাচ্ছে। আর আমি বুঝতে পারছি, অলৌকিক বলে কিছু হয় না! ভগবান আসলে মানিকতলার মোড়ে আর্ট সেলুনের নাপিতের নাম। তার কাছে ভরসা করে মাথার চুল দেওয়া যায়, প্রার্থনা দেওয়া যায় না।

আমি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম একা। শূন্য স্টেশনটা গুহার মতো লাগল। এবার? এবার কোথায় যাব? চোখ বন্ধ করে ফেললাম। হঠাৎ মনে হল, যাঃ, অণুর পুরো নামটাই যে জানা হল না আমার!

পনেরো

কুয়াশা আজ ঘুম ভাঙিয়েছে আমার। স্বপ্নের ভিতরে আজ কুয়াশা ঢুকে পড়েছিল ভোরবেলা আর তার আড়ালে কে যেন চলে যাচ্ছিল হাঁটতে হাঁটতে। আমি গন্ধ পেয়েছিলাম। অদ্ভুত বুনোফুলের গন্ধ এসে ডুবিয়ে দিয়েছিল আমায়। আর তাতে ডুবে যেতে যেতে ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে

গিয়েছিল আমার। আমি আধো চোখে মাথার কাছের জানলার পরদা সরিয়ে দেখেছিলাম বাইরেটা সাদা হয়ে আছে কুয়াশায়। ব্রাশ করে এসে তখন থেকে বসে আছি খাটের উপরে, একা। ভাল লাগছে না। কিচ্ছু ভাল লাগছে না আমার। মুখটাও কেমন যেন তেতো হয়ে আছে! কাল রাতে খাইনি আমি। স্টেশন থেকে পটাইয়ের সঙ্গে না গিয়ে সোজা বাড়ি চলে এসেছিলাম। আমার কেমন যেন ফাঁকা লাগছিল। নিজেকে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছিল। কেন আমি ঠিক সময়ে নিজের কথাটা বলিনি অণুকে? কোন মেয়ে আমার জন্য রান্না করেছে? সেধে হেল্প করেছে? অন্য মেয়ের কথা শুনে কোন মেয়ে এমন রাগ করেছে? হিংসে করেছে? আমি কি বুঝিনি? নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করেছিলাম? অণুকে কি আমি টেকেন ইট ফর গ্রান্টেড হিসেবে নিয়েছিলাম? পাত্তা দিইনি? নাকি ভেবেছিলাম, ও তো আছেই? না, কেউ থাকে না। ভালবাসার মানুষকে নিজের কাছে ধরে রাখতে হয়। ভালবাসাকে ধরে রাখতে জানাও একটা শিক্ষা। আমায় ছেড়ে চলে গিয়ে অণু শিখিয়ে গেল এটা। কিন্তু এমন শিক্ষা পেতে কার ভাল লাগে? কাল অনেক রাত অবধি একা শুয়েছিলাম। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, এমনটা হয়েছে। যেন বেশি করে বুঝতে পারছিলাম কী হারিয়েছি। আর থেকে থেকেই কেমন যেন বুনোফুলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। আচ্ছা গন্ধেরও কি স্মৃতি হয়? না স্বপ্নে গন্ধ ভেসে আসে?

সকালটা কেমন যেন থম মেরে আছে! বাইরে কে যেন একটা চাদর ঝুলিয়ে রেখেছে, এমন কুয়াশা! আজ শনিবার, ছুটি। ছুটির দিনগুলো যেন বিষময়! যেন মারতে আসছে আমায়। আমি ঠিক করেছি, প্যারিসই চলে যাব। গতকাল রাতে নীতীশকাকুকে তা জানিয়েও দিয়েছি। বলেছি যে, বাড়িটা ছেড়ে দেব তাড়াতাড়ি। প্রথমে মানিকতলায় ফিরে যাব, তারপর সেখান থেকে সময়মতো প্যারিস। আর তার আগে বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। সারাজীবন ধরে যে-ভুল, যে-অবজ্ঞা দেখিয়েছি, তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব। জীবনে অনর্থক জটিলতা বাড়িয়ে লাভ নেই

কোনও। সোমবারই কন্ট্র্যাক্ট পেপারটা সই করে দেব।

খাট থেকে উঠে পাশের ড্রয়ার খুলে কন্ট্র্যাক্টের তাড়াটা বের করে টেবিলে রাখলাম। পড়ে দেখব একবার। অবশ্য দেখার কিছু নেই। সই করে দিলেই হল। মোবাইলে সময় দেখলাম। সোয়া সাতটা বাজে। আর একটু পরেই ট্রেন এনজেপি পৌঁছে যাবে। এখন কি ট্রেনের জানলায় বসে রয়েছে অণু? হাওয়ায় ওর নরম চুলগুলো উড়ছে আনমনে? ও কার কথা ভাবছে এখন? সেই ডাক্তারের কথা? নিজের মনেই জোরে জোরে বলে উঠলাম, "তুমি কেন এমন করলে অণু?"

"আমি কী করেছি?"

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলাম, এ কে রে? কে কথা বলল? ঘাবড়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকালাম। কে কথা বলল? নাকি আমার মনের ভুল?

"কে?" আমি দুর্বল গলায় বললাম, "কে কথা বললে?"

অবাক হয়ে দেখলাম, আমার ঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকল অণু। অণু!

"কাল রাতে দরজা বন্ধ করে শোওনি?" অণু ঘরে ঢুকে চারিদিকটায় চোখ বোলাল।

আমি ভূত দেখার মতো করে বললাম, "তুমি?"

"ঘরের কী অবস্থা করেছ! কেউ থাকে এমনভাবে?"

আমার তখন সাড় ফেরেনি। বললাম, "কিন্তু তুমি? যাওনি?"

অণু আমার দিকে এগিয়ে এল, "গেলে ভাল হত?"

"তবে যে শুনলাম, তুমি চলে যাবে? স্টেশনে গিয়েছ?"

অণুর হাসির সঙ্গে সঙ্গে লম্বা দুটো টোল জেগে উঠল গালে, "আমার দুই বন্ধু এসেছিল। তাদের সি অফ করতে গিয়েছিলাম। আর আমি দেখলাম তো তুমি কেমন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে স্টেশনে ঢুকলে। ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পরে যখন ফিরছিলাম, তোমায় তো দেখেছি। আর তুমিই শুধু মাছধরার গল্প বলতে পারো, না? নীতীশজেঠু বা আমি পারি না?"

"অ্যাঁ? আমায় দেখেছ? তবে ডাকোনি কেন?"

"কেন ডাকব?" অণু ঠোঁটটা টিপে তাকাল আমার দিকে।

"বা রে! ডাকবে না! আমি কষ্ট পাচ্ছি এত আর তুমি ডাকবে না?"

"কেন কষ্ট পাচ্ছ? কী হয়েছে তোমার?" অণু ওর টলটলে দিঘির মতো চোখদুটো স্থির করল আমার চোখে। পায়ে পায়ে আরও এগিয়ে এল কি?

আবার বুনোফুলের মিষ্টি গন্ধটা পেলাম। আমার শরীর অবশ হয়ে এল। অস্ফুটে বললাম, "জানো না তুমি? তোমায় ছাড়া কত কষ্ট হয়, জানো না? বোঝো না যে, আমি তোমায় ভালবাসি?"

অণু একদম কাছে এসে দাঁড়াল এবার। গন্ধটা তীব্র হয়ে উঠল। মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে।

অণু আলতো করে হাত রাখল আমার চুলে। বলল, "আর মিকি?"

"কে?" আমি হাসলাম।

"তবে রে..." অণু বসে পড়ল আমার পাশে। আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে মাথা রাখল কাঁধে। বলল, "আমার কষ্ট হয়নি? তুমি যে তাকাতেই না আমার দিকে! আমার কষ্ট হত না? গতকাল আমি নরেনজেঠুর ওখানে ছিলাম। আজ সকালেই চলে এসেছি। তুমি আমায় আর কষ্ট দেবে না তো?"

আমি তাকালাম অণুর দিকে, "কষ্ট? তা সেই ডাক্তারের কী হবে?"

অণু আমার গায়ের সঙ্গে লেগে থেকে বলল, "সে তার মতো ডাক্তারি করবে। আমার কী তাতে?"

আমি অণুর মুখের দিকে তাকালাম। একটা অদ্ভুত সকাল যেন নামছে আমার মনের ভিতর! এক পাহাড় রোদ উঠছে সেখানে।

অণু টেবিলের কাগজটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওটাই কন্ট্র্যাক্ট? নীতীশজেঠু বলল। তুমি সত্যি চলে যাচ্ছ?"

"আমি? কলকাতা ছেড়ে যাব কোথায়? এমন কুয়াশা আর পৃথিবীতে কোথায় আসে?" আমি হাসলাম আবার।

"কই কুয়াশা?" অণুর কথায় আমরা একসঙ্গে বাইরে তাকালাম।

আর দেখলাম, আ রে, সত্যি তো! কুয়াশা কই? এ যে ঝলমলে রোদ! আমার এক পাহাড় রোদ!

"ওমা দেখো, পাখিটা দেখো," বাচ্চা মেয়ের মতো উচ্ছল হয়ে উঠল অণু।

আর আমি দেখলাম, ফিঙে! একটা লম্বা লেজের ফিঙে এসে বসেছে বাগানের কাঁঠালচাঁপার ডালে। আর ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকেই যেন দেখছে। কী বলছ ফিঙেবাবু? আমায় আর কোথায় যেতে বলছ? আমি যে আর কোথাও যাব না।

অণু আমায় জড়িয়ে ধরল, "বিয়ের পর একটা পাখি পুষব আমরা, কেমন?"

বিয়ে? আমার মাথায় টং করে ট্রামের ঘণ্টার মতো শব্দ হল। এই রে আবার প্রেমের বিয়ে? অণু যদি ব্রাহ্মণ না হয়?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার পুরো নামটা যেন কী?"

"কী? প্রেমে পড়েছ আর পুরো নাম জানো না?" অণু রেগে গেল হঠাৎ।

"আরে, তোমার প্রেমে পড়েছি! তোমার নামের প্রেমে তো পড়িনি। সরি, খুব ভুল হয়েছে। বলো না প্লিজ," আমি কাতর গলায় বললাম।

অণু কঠিন মুখে বলল, "অনঙ্গসেনা মুখার্জি। মনে থাকবে?"

"মুখার্জি? ব্রাহ্মণ? যাক!" আমি হেসে অণুর হাত ধরতে গেলাম।

"কী? এসব নিয়ে তোমার প্রেজুডিস আছে?"

"আরে, আমার নেই। আমার বাবা... মানে..."

"তুমি এমন?" অণু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

"আরে!" আমি হাত ধরলাম ওর, "কী হচ্ছে অণু? কেন টেনশন দিচ্ছ?"

অণু অভিমানী চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বলল, "ব্রাহ্মণ না হলে বুঝি বিয়ে করতে না?"

আমি কিছু বললাম না। এগিয়ে গিয়ে শুধু জড়িয়ে ধরলাম ওকে। সব

কথা সবসময় বলতে নেই। জীবনে বলা-না বলার রেশিওটা ঠিক রাখা দরকার চিরকাল। আমি শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম অণুকে। বুঝলাম, অণু নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে একদম। বাইরে রোদ বাড়ছে। সকাল গাঢ় হচ্ছে। আমরা কুয়াশাঘেরা শহর থেকে নেমে আসছি রোজকার দশটা-পাঁচটার শহরে।

আমি দেখলাম কাঁঠালচাঁপা একলা পড়ে আছে। ফিঙে উড়ে গিয়েছে ডাল শূন্য করে। কোথায় গেল ফিঙে? কার স্বপ্নে গিয়ে বসল আবার? কোন বাচ্চা মেয়ে আবার ঘুমে ডুবে যেতে যেতে দেখল মাইলের পর মাইল ধরে চলে যাচ্ছে ইলেকট্রিকের তার, আর সেই তারের উপর বসে দোল খাচ্ছে ফিঙে?

সবাই তো যেতেই চায়। খুঁজতেই চায় গন্তব্য। তাই একটা ফিঙে সারা জীবন উড়ে বেড়ায় আমাদের ভিতর। ছটফট করে সে। আমাদের তাড়িয়ে মারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। পৌঁছে দিতে চায় আমাদের ইচ্ছের কাছে। আর আমাদের এক-একটা করে ইচ্ছে যখন পূরণ হয়, আমরা দেখি সেই ফিঙে নেই! শূন্য ডাল আর পাতারা পড়ে আছে শুধু। আর আমরা শুনি কোনও মা তার সন্তানকে বলছে, "এই তো আমার বুকের কাছে। এই তো আমার চোখের মাঝে এসে বসেছে আমার ফিঙে।"

আমার মা তার ফিঙে পেয়েছিল! আর আমি পেলাম আমারটা। এবার দেখো, এই শহর থেকে, এই বাগান থেকে, এই গল্পের থেকে, তোমার কাছেই উড়ে গিয়ে বসল সেই ফিঙে। দেখো, সে লেজ নাচাচ্ছে। ছটফট করছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে তোমায়। দেখো, তোমার জীবনও জেগে উঠবে এবার। তুমিও এবার পৌঁছে যাবে তোমার ইচ্ছের কাছে। তোমার সারা জীবনের আনন্দের কাছে!

(মায়ের স্বপ্নটুকু শুধু সত্যি আর বাকি সবটাই বানানো!)

মায়ের মৃত্যুর পর লাল একা হয়ে যায় খুব। তারপর সে প্রেমে পড়ে মিকির। মিকির অবজ্ঞা, চাকরির চাপ আর নিজেদের ব্যাবসার ত্রিভুজে লাল জড়িয়ে পড়ে ক্রমশ। আর এসবের ফাঁকে লালের চোখে পড়ে বাড়ির সামনের বাগানে এসে বসা একটা ফিঙে। কী বলতে চায় এই ফিঙে?

9 789350 400906